মানবতার শত্রু পুঁজিবাদকে উচ্ছেদের লক্ষ্যে

মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা আয়ত্ত করুন

প্রভাস ঘোষ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

মানবতার শত্রু পুঁজিবাদকে উচ্ছেদের লক্ষ্যে মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা আয়ত্ত করুন — প্রভাস ঘোষ
(২৪ এপ্রিল, ২০২০-এর ভাষণ)

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ জুন, ২০২০

প্রকাশক ঃ অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ ২২৪৯-১৮২৮, ২২৬৫-৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ১০ টাকা

প্রকাশকের কথা

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ৭৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২৪ এপ্রিল, ২০২০-তে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ শিবপুর পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত কর্মীদের এক সভায় এই ভাষণটি দেন। উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাস রোগ সংক্রমণে দেশের হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হওয়ার কারণে এ বছর পার্টি প্রতিষ্ঠা দিবসে কোনও রাজ্যেই কেন্দ্রীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। ভাষণটি ৩ মে গণদাবী ইন্টারনেট সংস্করণে (ডিজিটাল বুলেটিন-৫) প্রকাশিত হয়। এখন সেটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল। প্রকাশকালে কমরেড প্রভাস ঘোষ নিজেই কিছু সংযোজন ও পরিমার্জন করেন।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়
কেন্দ্রীয় কমিটি
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

২০ জুন, ২০২০
কলকাতা ৭০০০১৩

মানবতার শত্রু পুঁজিবাদকে উচ্ছেদের লক্ষ্যে মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা আয়ত্ত করুন

২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস। এই দিনটি আমাদের দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মী-সমর্থক-দরদি এবং ভারতবর্ষের শ্রেণিসচেতন জনগণের কাছে এক গভীর আবেগের দিন। প্রতি বছরই আমরা এই দিনটিতে বিভিন্ন রাজ্যে কেন্দ্রীয় সমাবেশ করি এবং এই সমাবেশে দলের প্রতিষ্ঠাতা, মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক, আমাদের শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা স্মরণ করে সমসাময়িক পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করি। কিন্তু এই বছর একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক পরিস্থিতিচলছে। এই অবস্থায় শিবপুর সেন্টারের কমরেডরা আমাকে কিছু বলার জন্য বলেছেন। কিন্তু কাজটা খুবই কঠিন। এই মুহূর্তে গোটা বিশ্বে এবং ভারতবর্ষে যে মর্মন্তুদ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, যে ভয়ঙ্কর সঙ্কটের মধ্যে মানুষ এসে পড়েছে তা আমাদের প্রত্যেকের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বিশ্বে লক্ষ লক্ষ ঘরে আজ স্বজন হারানো কান্নার রোল। আমরা এই সভা যখন শেষ করব তার মধ্যে করোনা আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা আরও হাজার হাজার বাড়বে। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে অত্যন্ত ব্যথা-বেদনায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে অনেকটা নিজের সাথে লড়াই করে আমাকে বলতে হচ্ছে।

কতদিনে এই রোগের আক্রমণ বন্ধ হবে, আরও কত লক্ষ প্রাণহানি হবে, সেটা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। যে প্রশ্ন আমাকে ভাবাচ্ছে, এই ব্যাপক সংখ্যায় মানুষের রোগাক্রান্ত হওয়া এবং এই বিপুল সংখ্যক মৃত্যু— এটা কি অনিবার্য ছিল? আমি মনে করি নিশ্চয় তা নয়। যদিও এই রোগের আক্রমণ সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে ঘটেছে এবং এর প্রতিষেধক ও প্রতিবিধানের ওষুধ এখনও আবিষ্কার হয়নি, কিন্তু এই রোগের লক্ষণ কী কী, কীভাবে অতি দ্রুত এই রোগ একজন ব্যক্তি থেকে বহু ব্যক্তির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, যাকে কমিউনিটি মাস ট্রান্সমিশন বলা হয়, সতর্কতা হিসাবে কী কী ব্যবস্থা নিতে হয়, মাস ট্রান্সমিশন কীভাবে ঠেকানো যায়— এসবই রোগ শুরু হওয়ার একটু পর থেকেই জানা গেছে। যাঁরা খবরের কাগজ ও সংবাদমাধ্যমের সাথে পরিচিত তাঁরা জানেন, চীনের উহান শহরে নভেম্বর মাসের

শেষ দিকে বা ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে এই রোগ শুরু হয়। আপনারা জানেন চীন যদিও কমিউনিস্ট লেবেল লাগিয়ে চলে, বাস্তবে প্রতিবিপ্লবের পথে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে সেই দেশে পুঁজিবাদ কায়েম হয়েছে এবং এখন শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসাবে আধিপত্য বিস্তারে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে তীব্র বাণিজ্যিক লড়াইয়ে লিপ্ত আছে। আমাদের দেশের সিপিএম, সিপিআই অবশ্য এখনও চীনকে কমিউনিস্ট দেশ বলে মনে করে। কারণ ওদের মতো একই লেবেল চীনও লাগিয়ে রেখেছে। সংবাদপত্রে দেখেছি, উহান শহরে যখন প্রথম এই রোগ ধরা পড়ে তখন ডাঃ লি নামে একজন এই রোগের আক্রমণ সম্পর্কে সতর্কবার্তা দেন। কিন্তু চীনের কর্তৃপক্ষ এটাকে গুরুত্ব দিয়ে অনুসন্ধানের পরিবর্তে সেই ডাক্তারকে ধমক দিয়ে থামায়, অন্যায় করেছে বলে স্বীকারোক্তি করায় এবং খবরটা চেপে দেয়। ওই ডাক্তার কয়েকদিন বাদে এই রোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে নিজেই রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। কেন চীন এই খবর চেপে দিতে চেয়েছিল? চীন ভেবেছিল বাইরে জানাজানি হলে তাদের বাণিজিক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, মনে করেছিল, অল্পেতেই এটা ম্যানেজ করতে পারবে। এর কারণ উহান শহরটা চীনের বিরাট একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব। বিশ্বের প্রায় সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশের সঙ্গে এই উহান শহরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। এখানে সস্তায় মজুর খাটানো যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন দেশের মাল্টিন্যাশনালদের ইন্ডাস্ট্রি সেখানে আছে। ভারতের সাথেও এখানকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে। কিন্তু যখন রোগ ব্যাপকভাবে এই শহরে ছড়াতে থাকে তখন আর চেপে রাখা যায়নি। চীন প্রথম ২০ জানুয়ারি ঘোষণা করে এই রোগের কথা। ইতিমধ্যেই উহান শহরে কয়েক হাজার লোক মারা গেছে, আরও হাজার হাজার আক্রান্ত হয়েছে। চীন এই উহান শহরকে লক ডাউন বা কাট আপ করে দেয়, যাতে এই রোগ সমগ্র চীনে না ছড়ায়। এটা করলেও চীন কিন্তু বিদেশের সঙ্গে তখনও এই শহরের সম্পর্ক ছিন্ন করেনি এটা জেনেই যে, অন্য দেশেও এইভাবে এই রোগ ছড়াতে পারে। তার বাণিজ্যিক ক্ষতি যাতে না হয় সেজন্য চীন এটা করেনি। এই না করাটা খুবই নিন্দনীয় অপরাধ। অথচ এটা করলে সমগ্র বিশ্বে রোগ এইভাবে ছড়াত না। এরোপ্লেন ও জাহাজের মাধ্যমে এই শহরের সঙ্গে বাইরের সম্পর্ক তখনও স্বাভাবিক ছিল। সংবাদমাধ্যমে বেরিয়েছিল, উহান শহরে এই রোগে বিপুল সংখ্যায় লোক মারা যাচ্ছে। কিন্তু এটা জেনেও সাথে সাথে কোনও সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশ বাণিজ্যিক স্বার্থে উহান শহরের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন করেনি, নিজেদের দেশেও এই মারণ রোগকে মোকাবিলা করার জন্য কোনও প্রস্তুতি নেয়নি। এটাও মারাত্মক অপরাধ। মার্কিন দেশে প্রথম এই রোগের প্রকাশ ঘটে ২১ জানুয়ারি। ১৯ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে প্রশাসনিক কর্তারা সতর্ক করে বলে, এই করোনা ভাইরাসকে

মোকাবিলা করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা না নিলে মার্কিন জনগণ রক্ষা পাবে না। প্রেসিডেন্ট এ সতর্কবার্তা গ্রাহ্যই করেননি। ইতিমধ্যে রোগ ছড়িয়ে পড়েছে, আর প্রেসিডেন্ট ৬ মার্চ জনগণকে উপদেশ দিচ্ছেন শান্ত ও নিশ্চিন্ত থাকতে— এই রোগ নাকি অলৌকিকভাবে দূর হয়ে যাবে। এর পর যখন ব্যাপকভাবে সংক্রমণ ছড়াতে থাকে, তখন ১৬ মার্চ প্রথম মেনে নেয় যে বিপদ ঘটছে। তখন আর করার কিছু নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় রোগ ছড়িয়ে পড়েছে, তখন আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যায় আমেরিকা শীর্ষস্থানে।

এটা কি অনিবার্য ছিল? মার্কিন সরকার কেন ব্যবস্থা নিতে গড়িমসি করল? একদিকে চীনের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ করতে চায়নি, অন্য দিকে নিজের দেশেও কলকারখানা-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে চায়নি। আর এসবই করেছে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের স্বার্থে। ঠিক একইভাবে ইতিমধ্যে এই রোগ ভয়ঙ্করভাবে ইউরোপের ইটালি, স্পেন, ফ্রান্স ও জার্মানি সহ নানা সাম্রাজ্যবাদী দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সেইসব দেশও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মতো ভূমিকা নেওয়ার ফলে সেখানেও হাজারে হাজারে মানুষ মারা যাচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজের দেশে সমালোচনার মুখে পড়ে চীনকে দোষারোপ করে নিজের গা বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। কারণ কয়েকদিন পরেই আমেরিকায় নির্বাচন হবে। চীনের তুলনায় মার্কিন শাসকরা কম অপরাধী নয়। ভারত সরকারও এই রোগ সংক্রমণ রোধে সময়মতো কোনও প্রস্তুতি নেয়নি। যদিও ইতিমধ্যে চীন, ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইরান ইত্যাদি দেশে ওই রোগের আক্রমণ কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে এটা তাদের অজানা ছিল না।

ভারতে প্রথম রোগ ধরা পড়ে ৩০ জানুয়ারি, কেরালাতে। ৬ মার্চ ভারতে ৩১ জন করোনা রোগে আক্রান্ত হয়। অথচ ১৩ মার্চ দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন, এটা কোনও সমস্যাই নয়, আমরা সতর্ক আছি। ক'দিন আগেই ভারত সরকার ফেব্রুয়ারি মসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানায়। এর মধ্যে মধ্যপ্রদেশে সরকার ভাঙা-গড়ার খেলাও চলছে। কংগ্রেসের এমএলএ-দের টাকা দিয়ে কিনে নিতে সমগ্র কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা, বিজেপি নেতৃত্ব ব্যস্ত ছিল। রোগ নিয়ে মাথা ঘামাবার তাদের সময় কোথায়! তা ছাড়া বাণিজ্যিক স্বার্থে চীন সহ গোটা বিশ্বের সাথে বিমান ও জাহাজ চলাচল পুরোদমে চালু রেখেছিল ২৫ মার্চ পর্যন্ত। তার ফলে বিদেশ থেকে ব্যাপক সংখ্যক রোগাক্রান্ত মানুষ এ দেশে চলে এল এবং তাদের সংস্পর্শে রোগ ছড়াতে লাগল। এসব জেনেও বিজেপি সরকার ২৩ মার্চ পর্যন্ত পার্লামেন্ট চালু রাখল। ২৪ মার্চ মধ্যপ্রদেশে সরকার গঠনের ষড়যন্ত্র বিজেপি সফল করতে পারল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে ২৫ মার্চ সরকার কোনও পূর্বপ্রস্তুতি না নিয়েই লকডাউন ঘোষণা করল। কিন্তু লকডাউন করেই দায় সারল, যেন এতেই

রোগ ঠেকানো যাবে। বিদেশ থেকে আগতদের কোনও পরীক্ষা করা হল না। লকডাউন এলাকার মধ্যেও পাবলিকের পরীক্ষার কোনও বন্দোবস্ত হল না। পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কিট নেই। প্রয়োজনীয় হাসপাতাল ও বেডের ব্যবস্থা হল না। প্রয়োজনীয় ভেন্টিলেটর নেই। ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় পিপিই-র ব্যবস্থা করা হল না। অন্য দিকে লকডাউনের ফলে কোটি কোটি শ্রমিক কর্মচ্যুত হল, গরিব মানুষ জীবিকাচ্যুত হল, পরিযায়ী শ্রমিকরা আশ্রয় ও কর্মচ্যুত হল— এদের কী করে চলবে, কী খাবে তার কোনও বন্দোবস্ত হল না। প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা সংবাদমাধ্যমে নানা বাণী ঘোষণায় ব্যস্ত থাকলেন, যেন মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তাঁদের আহার-নিদ্রা চলে গেছে! আগামী ভোটের দিকে তাকিয়ে কে কত জনগণের ত্রাতা তা প্রমাণে ব্যস্ত হলেন। প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে একদিন সারা দেশে হাততালি ও ঘণ্টা বাজানো এবং আরেক দিন ঘরের আলো নিভিয়ে অন্ধকার করে বাইরে মোমবাতি, টর্চ, মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে করোনা তাড়ানোর আজব বন্দোবস্ত করলেন। আর এক দিন মিলিটারি-প্লেন থেকে পুষ্পবৃষ্টি করালেন। উদ্দেশ্য, একদিকে ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট সুড়সুড়ি দিয়ে তা বাড়ানো, অন্য দিকে তাদের দল ও সরকারের প্রতি অন্ধ আনুগত্য সৃষ্টি করা।

দেশের এত বড় দুঃসময়ে যথারীতি মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানোর কাজও বিজেপি চালিয়ে যাচ্ছে। বাড়তি সুযোগ পেয়ে গেল তবলিগ জামাতের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। ধর্মান্ধ মুসলিমরা এটা করেছিল যথারীতি সরকারি অনুমতি নিয়েই। বিদেশ থেকেও এসেছিল সরকারি অনুমতি নিয়েই। অনুষ্ঠান বন্ধেরও কোনও নির্দেশ সরকার দেয়নি। এদের মধ্যে কয়েকজনের করোনা রোগ ধরা পড়ে এটা ঠিক। কিন্তু তারা কি এই রোগ ছড়ানোর জন্য এই অনুষ্ঠান করেছিল? তারা করেছে ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য। যেমন প্রায় একই সময়ে তিরুপতিতে বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশ হয়েছে সরকারি অনুমতি নিয়েই। এর জন্য দায়ী যদি করতেই হয় তা হলে যে সরকার অনুমতি দিয়েছে, তাকেই দায়ী করতে হয়। অথচ সমগ্র দেশে বিষ ছড়ানো হচ্ছে এই বলে যে মুসলিমরাই করোনা রোগ নিয়ে এসেছে। একদিকে এটা করে যাচ্ছে যাতে আগামী দিনে এনপিআর-এনআরসি চালু করা সহজ হয়, অন্য দিকে প্রধানমন্ত্রী ও আরএসএস প্রধান সাধু সেজে বলছেন, করোনার জন্য কোনও ধর্মকেই দায়ী করা উচিত নয়। এসব ভণ্ডামিও চলছে।

এটা সকলেই জানে যে আন্দোলনকারী জেএনইউ-র ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলা চালাল মুখোশধারী গুণ্ডাবাহিনী। কিন্তু তারা কারা? একজনকেও খুঁজে পায়নি কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত পুলিশবাহিনী। পাবে কী করে? এরা কাদের আশ্রিত, তারা জানে। এটাও দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, কারা শাহিনবাগ আন্দোলনকারীদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য দিল্লির দাঙ্গা সংঘটিত করেছে। অথচ

করোনা আক্রমণে দেশবাসী যখন দিশাহারা, সেইসময় দাঙ্গার দায়ে অভিযুক্ত করে এনআরসি বিরোধী আন্দোলনকারীদের কারারুদ্ধ করছে। এই ক্ষেত্রে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার খুবই তৎপর। এই দুঃসময়ে জনগণকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির, শাসক দলগুলির ও এদের পৃষ্ঠপোষক পুঁজিপতিদের প্রকৃত চেহারা চিনে নিতে হবে।

এটাও বুঝতে হবে, যে রোগ সংক্রমণ ঘটেছে চীন থেকে, শুরুতেই যদি চীন নিজ দেশে যেটা করেছে, বিদেশের ক্ষেত্রেও সেইরকম করত এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলিও যদি সতর্ক হয়ে চীনের সাথে যোগাযোগ ছিন্ন করত, তাতে তাদের বাণিজ্যিক লাভের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হত ঠিকই, কিন্তু তাদের দেশে রোগের এই ব্যাপক বিস্তার ঘটত না, এত বিপুল প্রাণহানি ঘটত না। তা হলে এর জন্য কে দায়ী? এই ব্যাপক সংখ্যক আক্রান্ত এবং বিপুল হারে প্রাণহানি, এর জন্য কে দায়ী? এর জন্য দায়ী ভারত সহ সমগ্র বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশের কর্ণধাররা। কারণ এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতে মানুষের জীবনের কোনও মূল্য নেই। পুঁজিপতিদের কাছে মানুষের একমাত্র মূল্য শ্রমশক্তি হিসাবে, শোষণ যন্ত্রের উপকরণ হিসাবে। তাই মহান স্ট্যালিন বলেছিলেন, পুঁজিপতিদের কাছে শ্রমিক হচ্ছে, মনুষ্যদেহী কাঁচামাল, হিউম্যান র মেটেরিয়াল। কারখানা চালাবার জন্য যেমন কয়লা লাগে, সেই কয়লা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঠিক তেমনই মানুষের শ্রমশক্তিও পুঁজিবাদ ব্যবহার করে তার রক্ত শুষে নেয়, হাড়মাংস সব চূর্ণবিচূর্ণ করে শ্রমিকদের জীবন ছাই করে দেয়। এর ভিত্তিতেই পুঁজিবাদের শোষণযন্ত্র চলে। তাই কে বাঁচল, কে মরল এ নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। ফলে এই পুঁজিবাদ কত নিষ্ঠুর, নির্মম, অমানবিক, সেটা এই ঘটনা আবার দেখিয়ে দিয়ে গেল।

একই সাথে আমরা এটাও লক্ষ করে যাচ্ছি, বৈজ্ঞানিকেরা, পরিবেশবিদরা বারবার ওয়ার্নিং দিচ্ছেন, গ্লোবাল ওয়ার্মিং বাড়ছে— সমুদ্রের জলস্তর বাড়ছে। আন্টার্কটিকা ও মেরুঅঞ্চলে বরফ গলে যাচ্ছে, হিমালয়ের গ্লেসিয়ার ধ্বংস হচ্ছে, যার ফলে নদীগুলির জলের উৎসও ধ্বংস হচ্ছে। এ সবের ফলে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটছে। এটা মানবজাতির পক্ষে বিপজ্জনক। পরিবেশবিদরা বারবার বলছেন, গ্রিনহাউস গ্যাস কন্ট্রোল কর, ফসিল অয়েল ব্যবহার কমাও। কিন্তু কে কার কথা শোনে! তাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাভের স্বার্থে, ওয়ার ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থে তারা কেউ এসব কন্ট্রোল করতে রাজি নয়। মানবসভ্যতা বিপন্ন হোক, আপত্তি নেই। কিন্তু তাদের মুনাফার স্বার্থে আঘাত দেওয়া চলবে না। এই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ। ঠিক সেই একই জিনিস এই রোগের ক্ষেত্রেও দেখা গেল।

আরেকটা জিনিসও করোনা সংগ্রমণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে এই পুঁজিবাদী দেশগুলির অবহেলা কী নির্মম! প্রত্যেকটা দেশেই দেখা যাচ্ছে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাসপাতাল নেই, হাসপাতালে পর্যাপ্ত বেড নেই,

ডাক্তার নেই, নার্স নেই, পরীক্ষার কিট নেই, ভেন্টিলেটর নেই, পারসোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট যা দরকার তা নেই। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য যদি যথেষ্ট সংখ্যক হাসপাতাল থাকত, বেড থাকত, তা হলে এত মৃত্যু ঘটত না। এমনকী ডাক্তার-নার্সরাও মারা যাচ্ছেন। এর কারণ কী? এর কারণ স্বাস্থ্য বাজেট সব দেশেই সঙ্কুচিত। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী রাষ্ট্র গুরুত্ব দেয় মিলিটারি বাজেটের ওপর। গত বছর সামরিক খাতে ব্যয়বৃদ্ধিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্থানে, চীন দ্বিতীয় এবং ভারত তৃতীয় স্থানে ছিল। সব সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশই সামরিক উৎপাদন প্রবলভাবে বাড়াচ্ছে। এর জন্য অঢেল ব্যয় করছে। বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণাকে সঙ্কুচিত করছে। বিজ্ঞানের মৌলিক আবিষ্কারকে ব্যাহত করছে। স্বাস্থ্যের জন্যও যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের চর্চা দরকার, তার চর্চা, তার বিকাশকে ব্যাহত করছে। এই বিজ্ঞান চর্চা এভাবে ব্যাহত না হলে হয়তো অতি দ্রুত এই রোগের ওষুধ আবিষ্কার হতে পারত। এগুলো অবহেলা করা হয়েছে।

এখনকার অনেকেই জানেন না, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরেই মহান লেনিনের নির্দেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি লিগ অফ নেশনসে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সব রাষ্ট্র সামরিক উৎপাদন বন্ধ করুক। যুদ্ধ বন্ধ হোক। সামরিক বাজেটের প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্রের সব ব্যয় মানবকল্যাণে নিয়োজিত হোক। কিন্তু কোনও সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই রাজি হয়নি। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'-তে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই ভূমিকার প্রশংসা করেছিলেন। এই সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ প্রতিবিপ্লবে ধ্বংস হয়েছে। এই দেশ বেকারি সম্পূর্ণ দূর করে সকলের কাজের সুযোগ দিয়েছিল। অবৈতনিক শিক্ষা যেমন সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত চালু করেছিল, তেমনই এই দেশ চালু করেছিল বিনা ব্যয়ে সর্বজনীন চিকিৎসা। দুনিয়ার সব থেকে বেশি হাসপাতাল, বেড, ডাক্তার, নার্স সেই দেশে ছিল। প্রতি আড়াইশো জন নাগরিক পিছু একজন ডাক্তার ছিল, ১০০ জন নাগরিক পিছু একজন নার্স ছিল। একবার ভেবে দেখুন, জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষাকে তারা কী চোখে দেখেছে! রোগাক্রান্ত যে কোনও মানুষ সোভিয়েট ইউনিয়নে যে কোনও হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা পেত। এই দেশ বিজ্ঞানচর্চায়, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান চর্চায় বিপুল অর্থ বরাদ্দ করত। আজ যদি সেই দেশ থাকত, সমাজতান্ত্রিক শিবির থাকত, তা হলে বিশ্বের পরিস্থিতি অন্য রকম হত। স্বাস্থ্যকে অবহেলা করা, চিকিৎসাকে অবহেলা করা— এ ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ দায়ী। যার ফলে একটা রোগের আক্রমণে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে। আবার দেখুন, করোনা আক্রান্ত রোগী বাড়ছে, হাসপাতালে জায়গা নেই, বেড নেই। ফলে ক্যানসার, হার্টের রোগী, নিউমোনিয়া রোগী, ডায়ালিসিসের রোগীর কোনও চিকিৎসা হচ্ছে না। এইসব রোগেও বহু লোক মারা যাচ্ছে।

একই সাথে আরেকটা জিনিসও ঘটল। লকডাউনের ফলে সমস্ত কলকারখানা বন্ধ হয়েছে। বিশ্বে এবং আমাদের দেশে কোটি কোটি শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়েছে। এ ছাড়া অসংখ্য সাধারণ মানুষ যারা কোনও রকমে দু'পয়সা রোজগার করে জীবিকা নির্বাহ করত তারাও কর্মচ্যুত। এরা হাজারে হাজারে অনাহারে মারা যাচ্ছে। সংবাদমাধ্যমে যে জ্বলজ্বল করছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির রিলিফের ঘোষণা, নানা স্কিম— অনাহারক্লিষ্ট জনগণ জানে না, সেগুলি কে পাচ্ছে। রেকর্ড রাখলে হয়ত দেখা যেত, করোনায় আক্রান্তের থেকে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি। অক্সফামের হিসাব অনুযায়ী আমাদের দেশে দৈনিক সাত হাজার লোক অনাহারে মারা যায়। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স-এ গত বছর ১১৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ছিল ১০২। ভারতের শাসকবর্গ গর্ববোধ করতে পারে! অবশ্য এ দেশের এক শতাংশ ধনী দেশের মোট সম্পদের ৭৩ শতাংশের মালিক। এই করোনা সঙ্কটে জর্জরিত সময়ে খবর এল মুকেশ আম্বানি এশিয়ার বৃহত্তম ধনীর স্থান দখল করেছে। একদিকে এই অগ্রগতি, অন্য দিকে কোটি কোটি দরিদ্র, নিপীড়িত, ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার।

পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা আজ ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছে। আমাদের দেশে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কয়েক কোটি। পরিযায়ী শ্রমিক শব্দটাই হাল আমলের। এলাকায় রুজি রোজগার নেই, পেটের দায়ে লাখে লাখে গরিব মানুষ ছুটছে এই শহরে, ওই শহরে, এই রাজ্যে, ওই রাজ্যে, আবার বিদেশেও। যেখানেই সামান্য কিছু রোজগারের সন্ধান পায় সেখানেই ছোটে। এদের কাজের স্থায়িত্ব নেই, সময়ের স্থিরতা নেই, মজুরির স্থিরতা নেই, আশ্রয়ের নিশ্চয়তা নেই, সবটাই মালিকের বা কন্ট্রাক্টরের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। এই নতুন ধরনের শ্রমিকও পুঁজিবাদের সৃষ্টি। লকডাউনের আগে কোনও সরকার একবারও ভাবেনি এদের অবস্থা কী হবে। এতটুকু যদি তাদের মাথাব্যথা থাকত, আগে তো তাদের ঘরে ফেরাবার ব্যবস্থা করত। ঠিক যেমন মধ্যপ্রাচ্যে আমরা দেখি, সিরিয়ার যুদ্ধের ফলে, প্যালেস্টাইনের যুদ্ধের ফলে, লিবিয়ায় আক্রমণের ফলে শরণার্থীরা পাগলের মতো ভূমধ্যসাগরের দিকে ছুটছে ইউরোপে পৌঁছাবার জন্য। সাগরে ডুবেও অনেকে মারা গেছে। রোহিঙ্গারা মায়ানমারে মার খেয়ে বিতাড়িত হয়ে পাগলের মতো ছুটছে। পরিযায়ী শ্রমিকরাও সেইভাবে পাগলের মতো ছুটছে। অনেকে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ছুটছে। সেদিন খবরে বেরোল একটা বাচ্চা মেয়ে কয়েকশো মাইল হেঁটে বাড়ি ফিরতে গিয়ে মারা গেছে। প্রকাশ্য রাস্তায় এলে পুলিশ মিলিটারি মারবে তাই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আসতে গিয়ে পথেই মারা গেল। এভাবে রাস্তাতেই অনেকে মারা গেল। কে তাদের খোঁজ রাখে! বাসে-ট্রাকে গাদাগাদি করে আসতে গিয়ে ক্ষুধার্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে, রেলের চাকায় পিষ্ট হয়ে কতজন মারা গেল, কে তার হিসেব রাখে! কত শিশু পথে জন্মে

পথেই মারা গেল! এদের একদলকে রেখেছে রেখেছে হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের মতো অবস্থায়। সেখানে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার কোনও প্রশ্ন নেই। না কেন্দ্রীয় সরকার, না কোনও রাজ্য সরকার, কেউই কোনও দায়িত্ব পালন করছে না। এই হচ্ছে জনগণের প্রতি এই দলগুলির দরদ! আবার এই দরদই উথলে পড়বে যখন ভোট আসবে। তখন এরাই টাকার থলি নিয়ে ঘুরবে ক্ষুধার্ত মানুষকে কেনার জন্য। এই হচ্ছে পুঁজিবাদের চেহারা!

এই সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংঘটিত করার আহ্বান জানিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং-এর শিক্ষাকে ভিত্তি করে ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলকে গড়ে তুলেছিলেন। ফলে আজকের দিনটিতে আমাদের ভাবতে হবে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা আমাদের কী করতে বলে।

আপনারা জানেন, এমনিতেই বিশ্বে মন্দা চলছিল। ওরা মন্দার পরিবর্তে বলছিল 'স্লোয়িং ডাউন অফ ইকনমি'। বাস্তবে মন্দাই চলছিল। গত বছরই আমাদের দেশে ৬ লক্ষ ৮০ হাজার ছোট-বড় কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ১০ কোটি শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়েছিল। এগুলি সরকারি হিসাব। করোনা আক্রমণের পর আরও কয়েক কোটি মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে একই অবস্থা চলছে। কবে করোনার আক্রমণ থামবে জানা নেই। ইতিমধ্যেই ইউরোপ-আমেরিকায় দাবি উঠেছে, আমাদের দেশেও উঠছে— এমনিতেই অনাহারে মরছি, ফলে লকডাউন তুলে নাও। মালিকরা চাইছে মুনাফার স্বার্থে, শ্রমিকরা চাইছে, গরিব মানুষ চাইছে পেটের জ্বালায়। এই ব্যাধির আক্রমণ যখন থামবে তখন আমরা একটা নতুন বিশ্ব দেখব। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ১৯৩০ সালে একটা মহামন্দা এসেছিল। তার চেয়েও আরও ভয়ঙ্কর মন্দা আসছে। অজস্র কলকারখানা বন্ধ, কোটি কোটি ছাঁটাই শ্রমিক, কোটি কোটি ক্ষুধার্ত মানুষ পথেঘাটে মরছে, ভুখা মানুষের মিছিল, গোটা বিশ্বের এই চেহারা হবে। এই একটা দিক।

আরেকটা দিক হচ্ছে, শক্তির ভারসাম্যেরও পরিবর্তন ঘটবে। এতদিন পর্যন্ত বিশ্বে আমেরিকা ছিল এক নম্বর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। দ্বিতীয় ছিল জাপান। কিন্তু ইতিমধ্যে জাপানকে হটিয়ে চীন এসে গেছে দ্বিতীয় নম্বরে। চীন এবং আমেরিকার প্রবল বাণিজ্য যুদ্ধ চলছিল সাম্রাজ্যবাদী হিসাবে কে কোথায় কতটা লুণ্ঠনক্ষেত্র দখল করবে, কে কোথায় কতখানি আধিপত্য বিস্তার করবে এই নিয়ে। ইতিপূর্বে দুটি বিশ্বযুদ্ধ একই কারণে ঘটেছে। এখন বাণিজ্য যুদ্ধ চলছে। অস্ত্রের আক্রমণ না থাকলেও এতে বহু কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে, অসংখ্য শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়ে অনাহারে মরছে। চলতি কথায় আছে, হাতে না মেরে ভাতে মারছে। করোনা পরবর্তীকালে চীন আরও শক্তি সঞ্চয় করে আসছে। ইতিমধ্যেই চীন এই সুযোগে ইউরোপে

কলকারখানা কিনছিল, পুঁজি বিনিয়োগ করছিল। ভারতেও কিছু শেয়ার কিনেছে, আরও কিনতে যাচ্ছিল। এইভাবে সে তার আধিপত্য বিস্তার করছিল। ভারত সরকার আইন করেছে, চীন যাতে এ দেশে বিনা অনুমতিতে শেয়ার বা কারখানা কিনতে না পারে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশও আতঙ্কিত হয়ে একই সিদ্ধান্ত করেছে। কিন্তু চীন ধীরে ধীরে থাবা বিস্তার করছে নানা জায়গায়। তার উৎপাদন শিল্পগুলি অক্ষত রয়েছে। অন্যান্য দেশে লকডাউন চলছে। চীনে এখন লকডাউন নেই। ফলে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে সে বিশ্বের বাজার গ্রাস করছে। এমনকি যে কিট সে বিক্রি করেছে সেখানেও দেখা যাচ্ছে দুর্নীতি, কাজ দিচ্ছে না। ইউরোপ তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ভারত সরকারও প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছে। এরপর হয়ত দেখা যাবে চীন একনম্বর সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে—যেটা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কিছুতেই হতে দিতে চাইবে না। তার ফলে চীন ও আমেরিকার প্রচণ্ড লড়াই হবে এই নিয়ে। সেটা শেষপর্যন্ত বাণিজ্য যুদ্ধেই সীমাবদ্ধ থাকবে কি না, নিশ্চয়তা নেই। ট্রাম্প যে আমেরিকায় দ্রুত লকডাউন তুলতে চাইছে তার কারণ আমেরিকার ইন্ডাস্ট্রি যদি পিছিয়ে যায় তা হলে চীনের আধিপত্য বাড়বে— এই তার উদ্বেগ। এটাও তার পুঁজিবাদী স্বার্থ। জনগণের স্বার্থের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। আবার লক্ষ করুন, করোনা রোগের আক্রমণে সব দেশই আক্রান্ত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশগুলির প্রত্যেকের মধ্যে মুনাফা ও বাণিজ্যিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব এত প্রবল যে এই রোগের বিরুদ্ধে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াচ্ছে না। সকলের বৈজ্ঞানিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করছে না। একে অপরকে বিপদে সাহায্য করছে না। মেডিকেল সাহায্যের ক্ষেত্রেও হিসাব কষছে— কে কাকে ঠকিয়ে কত লাভ করতে পারবে।

দেখা যাচ্ছে করোনা যুদ্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়নেও ঐক্য থাকছে না। যারা বেশি আক্রান্ত— ইটালি, স্পেন, ফ্রান্স— তারা চাইছে ঐক্যবদ্ধভাবে করোনার মোকাবিলা করা হোক, করোনাকে ভিত্তি করে একটা ফান্ড খোলা হোক। কিন্তু যারা কম আক্রান্ত, সেই জার্মানি, নেদারল্যান্ড এতে রাজি নয়। আজকেও কাগজে আছে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না। পুঁজিবাদী স্বার্থের এইরকম সব সংঘাত চলছে। একদিকে বিশ্বে শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। ফলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত আরও তীব্র হবে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভিত্তিও টলটলায়মান। অন্য দিকে আক্রান্ত হবে শ্রমিক শ্রেণি। আমেরিকায়, ইউরোপে, আমাদের দেশে শ্রমিকদের বহু অধিকার যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তারা লড়াই করে আদায় করেছিল, তা পুঁজিপতিরা ইতিমধ্যেই বহুলাংশে কেড়ে নিয়েছে। সামান্য ছিটেফোঁটা যা অবশিষ্ট ছিল, এখন তাও সম্পূর্ণ কেড়ে নেবে। অল্প শ্রমিক দিয়ে কম মজুরিতে বেশি খাটানো চলবে। অটোমেশন, ডিজিটালাইজেশন ব্যাপকভাবে চালু হবে। অর্থাৎ

পুঁজিবাদের মুনাফার স্বার্থে লেবার ইনটেনসিভের পরিবর্তে ক্যাপিটাল ইনটেনসিভ উৎপাদন পদ্ধতি চালু হবে ব্যাপকভাবে। কাজের সময়ের কোনও সীমা থাকবে না। নির্দিষ্ট মজুরি বলেও কিছু থাকবে না। মালিকরা যখন তখন ছাঁটাই করে দিতে পারবে, যখন তখন কারখানা বন্ধ করে দিতে পারবে।

আরেকটা প্রশ্নেরও সৃষ্টি হচ্ছে— এই সঙ্কটের মধ্যে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে কীভাবে টিকিয়ে রাখা যায়। এই সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদকে নিয়ে এখন অনেক লেখালেখি চলছে। পুঁজিবাদকে রক্ষা করার জন্য যেসব অর্থনীতিবিদরা রয়েছে তারা নানা টোটকা বাতলাচ্ছে। একদল কেইনসের থিওরির কথা বলছে। ১৯৩০ সালে মহামন্দার সময়ে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা একেবারে তলানিতে ঠেকেছিল, বাজার খুবই সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। ফলে কারখানার পর কারখানায় লালবাতি জ্বলেছিল, লোকের কাজ না। একমাত্র সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ছাড়া সব দেশেই এই সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল। তখন বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ কেইনস সাহেব বুর্জোয়া দেশগুলিকে পরামর্শ দিয়েছিল, বাড়তি নোট ছাপাও, ছাপিয়ে পাবলিককে দিয়ে দাও। তা হলে পাবলিকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। এটা কৃত্রিমভাবে বাড়ানো। এর ফলে উল্টো দিকে সমস্যা হয়। নোট ছাপানোর একটা নীতি থাকে। অর্থনীতিতে মোট উৎপাদিত পণ্য যদি টাকার অঙ্কে ১০০ টাকা হয়, মোট চালু টাকার পরিমাণ যদি ১০০ হয়, তবে প্রতি ইউনিট পণ্যের দাম দাঁড়ায় ১ টাকা। এখন যদি নতুন ছাপানো ১০০০ টাকার নোট বাজারে ছাড়া হয়, তবে প্রতি ইউনিট পণ্যের দাম বেড়ে দাঁড়াবে দশ টাকা। অর্থাৎ পণ্যের দাম বেড়ে গেল, টাকার দাম কমে গেল। একেই বলে ইনফ্লেশন। কেইনস সাহেব আরও বলেছিলেন, যখন কাজ নেই, তখন কাজ সৃষ্টি কর। কিছু লোককে দিয়ে মাটি কেটে গর্ত খোঁড়, আবার কিছু লোককে দিয়ে সেই গর্ত ভর্তি করাও। এই সাজেশন এখন আবার কেউ কেউ দিচ্ছে মুমূর্ষু পুঁজিবাদকে বাঁচাবার জন্য। আরেক দল বলছে, মালিকরা যা লাভ করবে তার একটা অংশ রাষ্ট্র নিয়ে শ্রমিকদের দিক। এটা হচ্ছে শেয়ারিং অফ প্রফিট। এইসব নানা থিওরি আজ আসছে পুঁজিবাদকে রক্ষা করার জন্য। তাতেও কি শেষরক্ষা হবে? পুঁজিবাদকে রক্ষা করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এই সঙ্কট পুঁজিবাদের অনিবার্য পরিণতি।

বহুদিন আগে মহান মার্কস দেখিয়েছেন, পুঁজিপতি লাভ করে শ্রমিককে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে। অ্যাডাম স্মিথ বলেছিলেন, সম্পদের স্রষ্টা হচ্ছে শ্রম। মহান মার্কস বলছেন, যে শ্রমিকের শ্রমশক্তি সম্পদ সৃষ্টি করছে, সেই শ্রমিক কেন সম্পদের মালিক হবে না। তিনি দেখালেন, পুঁজিরও স্রষ্টা শ্রমশক্তিই। মার্কস একেবারে অঙ্ক কষে দেখালেন, আনপেইড লেবার (শ্রমিকের প্রাপ্য মজুরির না দেওয়া অংশ) থেকে মালিকের লাভ আসছে। ফলে শ্রমিক ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর এই শ্রমিকই বাজারের ক্রেতা। ফলে সবসময়ই পণ্যের মূল্যের

তুলনায় মজুরি কম থাকে। আর এর ফলেই পুঁজিবাদী অর্থনীতি বাজার সঙ্কট সৃষ্টি করে। মার্কস ১৭৫ বছর আগে যেটা বলেছেন— মালিক শ্রমিককে ততটুকুই মজুরি দেয় যতটুকু মজুরি দিলে একটা শ্রমিক সপরিবারে বাঁচতে পারে এবং কাজ করতে পারে। যার থেকে 'প্রয়োজন ভিত্তিক মজুরি' (নিড বেসড ওয়েজ) কথাটা এসেছিল। আজকের দিনে সেটাও আর কার্যকর নয়। কারণ তখন মজুর দরকার ছিল বলেই মজুরের বংশধরেরও দরকার ছিল। সেই ভিত্তিতে মজুরি ঠিক হত। এখন অসংখ্য বেকার মজুর। ফলে প্রয়োজনভিত্তিক মজুরি বলেও বাস্তবে আর কিছু নেই। পরবর্তীকালে মহান লেনিন দেখালেন, পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজির স্তরে এসেছে, লগ্নি পুঁজির জন্ম দিয়েছে। এই যুগ সাম্রাজ্যবাদ ও জরাগ্রস্ত পুঁজিবাদের সঙ্কটের যুগ। সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পুঁজিবাদ নিজের দেশে বাজার সঙ্কুচিত হওয়ার কারণে, অনুন্নত দেশের কাঁচামাল ও শ্রমশক্তি সস্তায় লুঠ করতে এবং বাজার দখল করতে ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক নীতি নিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীরা লুঠের বাজার দখলের জন্য পরস্পর যুদ্ধ বাধাচ্ছে। লেনিন দেখালেন, সাম্রাজ্যবাদই যুদ্ধ বাধায়।

এরপর স্ট্যালিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেখালেন, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে ম্যাক্সিমাম প্রফিটের জন্য। ম্যাক্সিমাইজেশন অফ প্রফিট চাই। এর জন্য চাই ম্যাক্সিমাইজেশন অফ এক্সপ্লয়টেশন। স্ট্যালিন আরও বললেন, আগে বুর্জোয়া অর্থনীতির যে আপেক্ষিক স্থায়িত্ব ছিল, এখন আর তা নেই। তিনি বললেন, কনজিউমার ইন্ডাস্ট্রির মার্কেট সঙ্কুচিত হচ্ছে। ফলে পুঁজিবাদের প্রয়োজনে মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রির মার্কেট তৈরি হচ্ছে। রাষ্ট্রই অস্ত্র কিনবে জনগণের টাকায়। আর এর প্রয়োজনে যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টি করতে হবে, মাঝেমাঝে যুদ্ধ বাধাতে হবে— স্থানীয় যুদ্ধই হোক বা বড় যুদ্ধ। ফলে এখানেও পুঁজি বিনিয়োগ হবে। এটাই হচ্ছে মিলিটারাইজেশন অফ ইকনমি।

তারপর কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন বুর্জোয়া অর্থনীতির শুধু আপেক্ষিক স্থায়িত্ব নেই তাই নয়, পুঁজিবাদের এখন এবেলা-ওবেলার সঙ্কট। সকালে একরকম, বিকালে আরেক রকম। পুঁজিবাদ একটা সঙ্কটের থেকে বের হতে গিয়ে আরও গভীর সঙ্কটে ডুবছে। আর বললেন, বড়-ছোট সব সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশই অর্থনীতির সামরিকীকরণের পথ নিয়েছে। ভারতও তাই। আর আমরা এখন দেখছি মুহূর্তে মুহূর্তে সঙ্কট— শেয়ার বাজার টলমল করছে। গোটা বিশ্বে পুঁজিবাদের প্রবল বাজার সঙ্কট চলছে। আর দেখছি, মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশন, ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশন নিজেদের জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থের থেকেও মুনাফা লুণ্ঠনের স্বার্থকেই বড় করে দেখছে। তাই সস্তায় মজুর ও কাঁচামাল ব্যবহার করে বিদেশে আউটসোর্সিং করাচ্ছে। সেই পণ্যই নিজ দেশে ও অন্যত্র বেশি দামে বিক্রি করছে। নিজ দেশের পুঁজি ও ইন্ডাস্ট্রি অন্য দেশে নিয়ে যাচ্ছে। ভারতের পুঁজিপতিরাও বিদেশে পুঁজি

বিনিয়োগ করছে, কারখানা-খনি কিনছে। এদের জাতীয় স্বার্থ বলতে ততটুকু, নিজেদের লুণ্ঠনের স্বার্থে যতটুকু জাতীয় রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা যায়। তাই এদের ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। এই কারণেই আমেরিকায় যখন প্রবল ভাবে বেকারি বাড়ছে তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট সেখানকার শিল্পপতিদের উপর চাপ দিচ্ছেন বিদেশে আউটসোর্সিং বন্ধ করার জন্য। নিজের দেশে পুঁজি বিনিয়োগ করতে বলছেন। হুমকি দিচ্ছেন, তা না করলে রাষ্ট্র সব সুবিধা বন্ধ করে দেবে। এটা করা হচ্ছে মার্কিন পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে বাঁচাবার স্বার্থেই। কারণ যে-কোনও মুহূর্তে 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট' আবার মাথা তুলতে পারে, দেশে এমনই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। যার জন্য নিজে গ্লোবালাইজেশনের হোতা হয়েও আজ তার নিজের দেশের অর্থনীতি সঙ্কটগ্রস্ত হওয়ায় নিজেই গ্লোবালাইজেশনের বিরোধিতা করছে। ঘোষণা করেছে 'আমেরিকান ইন্টারেস্ট ফার্স্ট'।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৩০ সালের চেয়েও ভয়ঙ্কর মন্দা আসছে। রাষ্ট্রসংঘের ওয়ার্ল্ড ফুড ডিরেক্টর ইতিমধ্যেই ওয়ার্নিং দিয়েছেন 'ক্ষুধার মহামারি' আসছে। তাঁর হিসাবে ইতিমধ্যেই বিশ্বে প্রায় ১০০ কোটি মানুষ প্রতিদিন ক্ষুধার্ত থাকে। এই সংখ্যা আরও বহুগুণ বাড়বে। কোটি কোটি বেকার, বুভুক্ষু মানুষের মিছিল গোটা বিশ্বের সাথে আমাদের দেশেও ঘটবে। ট্র্যাজেডি হচ্ছে, বিশ্বে কোনও শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি নেই যে আজকে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই সংঘটিত করতে পারে। ভারতেও আমরা এককভাবে তা সংঘটিত করার মতো অবস্থায় নেই। এরকম একটা অবস্থার সম্মুখীন আমরা। করোনা আক্রমণের আগে আমাদের দলের কর্মীরা বিভিন্ন রাজ্যে এনআরসি-র বিরুদ্ধে আন্দোলনে নিযুক্ত ছিল। একমাত্র আমাদের দলই সমস্ত শক্তি নিযুক্ত করে এই আন্দোলনের মধ্যে ছিল। আন্দোলন একটা ব্যাপক রূপ নিচ্ছিল। সংখ্যালঘুরা জীবনমরণের স্বার্থে এগিয়ে এলেও সংখ্যাগুরু মানুষের পরোক্ষ সমর্থনও এই আন্দোলনের পক্ষে ছিল। এই সময়ই আকস্মিকভাবে করোনার আক্রমণ এল।

করোনার আক্রমণের পর দলের পক্ষ থেকে সমস্ত কর্মীদের আমরা জানাই যাতে তাঁরা রোগের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য মেডিকেল নিয়মকানুনগুলি মেনে চলেন। অন্য সময় কমরেডরা সারাদিন অন্য কাজকর্মের মধ্যে ব্যস্ত থাকতেন। ফলে পড়াশোনায় যে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, তা দিতেন না। যদিও আমি মনে করি, যতই কাজের চাপ থাক পড়াশোনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেই প্রতিদিনের কাজের অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত প্রত্যেক কর্মীর। এটা লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং, কমরেড শিবদাস ঘোষ সকলেরই শিক্ষা। এই সময় কর্মীরা পড়াশোনার অনেকটা সুযোগ পেয়েছেন। তাদের বলা হয়েছে পড়াশোনা করতে। সব জায়গায় কর্মীরা তা করছেন। আরেকটা জিনিসও কর্মীদের

বলা হয়েছে। বিভিন্ন সেন্টারে, অফিসে যারা একত্রে থাকেন— অন্য সময় কাজে সারাদিন বাইরেই থাকেন, এখন সবসময় একত্রে থাকতে হচ্ছে। ফলে এইসময় পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়াটা উন্নত করার জন্য কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাসোসিয়েশন, কনস্ট্যান্ট কমন ডিসকাশন, এগুলির মাধ্যমে কালেক্টিভ লাইফকে ইমপ্রুভ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। কমরেডরা যেন সেই সুযোগ কাজে লাগান। এ ছাড়াও কমরেডদের কাছে আরেকটা ইনস্ট্রাকশন গিয়েছিল— কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সংবাদমাধ্যমে যেসব রিলিফ ঘোষণা করেছে, সেইগুলি যাতে গরিব মানুষ পান, এর জন্য কর্তৃপক্ষের উপর চাপ দিতে, দাবি উপস্থিত করতে। আর বলা হয়েছে, নিজ নিজ এলাকায় এর মধ্যেই যতটা সম্ভব ত্রাণ বণ্টন করতে। আমাদের কমরেডরা সংবেদনশীল। মানুষের সঙ্কট দেখে তাঁরা ছটফট করছেন। বারবার তারা চেয়েছেন আরও উদ্যোগ নিয়ে নেমে পড়তে। এই পরিস্থিতির মধ্যেও যথাসাধ্য সম্ভব তারা করেছেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন। এ ছাড়াও বেশ কিছু রাজ্য পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য নিজের নিজের রাজ্য সরকারের উপর চাপ দিয়ে বেশ কিছু দাবি আদায় করেছে, কিছু খাদ্যসামগ্রী বণ্টনও করেছে।

আগামী দিনে যে প্রয়োজন আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে ভারতের বুকে এবং বিশ্বে সেই প্রয়োজনে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে আমরা যাতে যথার্থ ভূমিকা নিতে পারি সে সম্পর্কে আমাদের গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা দরকার। প্রথমত, যেখানে লকডাউন শিথিল হচ্ছে সেইসব জায়গার কর্মীরা মেডিকেল সিকিউরিটি বজায় রেখে যথাসম্ভব রিলিফের কাজে আরও আত্মনিয়োগ করবেন। মনে হচ্ছে, কিছু জায়গায় লকডাউন তুলে নেওয়া হবে। কিন্তু কমরেডদের এ কথা মনে রাখতে হবে, কে করোনা ভাইরাস ক্যারি করছে, কে করছে না তা বোঝার উপায় নেই। ফলে সব সতর্কতা মেনেই সেইসব জায়গায় রিলিফের কাজে তাঁরা নামবেন। আর যখন পুরোপুরি লকডাউন তুলে নেওয়া হবে তখন আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করব রিলিফ সংগ্রহ করা এবং বন্টনের কাজে। এটা করতে হবে দলের নামে, গণসংগঠনের নামে, বিভিন্ন ফোরামের নামে। ইতিপূর্বে আমরা বিভিন্ন ফোরামের মাধ্যমে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি। তাঁদেরও আমরা রিলিফ সংগ্রহ এবং বন্টনের ক্ষেত্রে সামিল করব। তাতে যদি পাবলিক কমিটি করতে হয় পাবলিক কমিটিই করব। অন্য দলের লোককেও যদি এই কাজে পাই তাঁদেরও সামিল করব। আমাদের দলের সকল স্তরের সদস্য ছাড়াও গণসংগঠনগুলির সাধারণ সদস্য, দলের সমর্থক, কর্মীদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, একসময়ে কাজে ছিল এখন পারেন না, আগ্রহী সাধারণ মানুষ— সকলকেই আমরা এই কাজে যুক্ত করব। দেশে বিদেশে যে ধরনেরই হোক, যেমন যোগাযোগ আছে, এই রিলিফ সংগ্রহ করা এবং বন্টনের ক্ষেত্রে আমরা কাজে লাগাব। এটাকে সর্বাধিক

গুরুত্ব দিয়ে আমাদের করতে হবে। যেখানে ঝান্ডা নিয়ে কাজ করা যায় করব। যেখানে তা করা যাবে না, ঝান্ডা ছাড়াই আমরা কাজ করব। যেখানে প্রয়োজন, পাবলিক কমিটি করেই করব। আমি জানি, আমাদের দলের কর্মীদের মানবিক মূল্যবোধ উন্নত স্তরের। তারা অবশ্যই এই কাজে উদ্যোগী হবেন। অন্য দিকে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে হবে যাতে ব্যাপকভাবে রিলিফ দেয়।

এ ছাড়া সামগ্রিকভাবে আমাদের দল, দলের বিভিন্ন শ্রেণিসংগঠন ও গণসংগঠন এবং ফোরামগুলিকে প্রস্তুত থাকতে হবে জনগণের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনের জন্য। খাদ্যের দাবিতে ক্ষুধার্ত মানুষ, চাকরির দাবিতে কর্মচ্যুত শ্রমিক ও বেকার যুবক, চরম সঙ্কটগ্রস্ত খেতমজুর, গরিব ও মাঝারি কৃষক, পরিযায়ী শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ছাত্র-যুবক— বিভিন্ন স্তরের দুর্দশাগ্রস্ত জনগণ নানা স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়বে, বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠবে— পাবলিক কমিটি গঠন করে এগুলিকে সুসংহত, সংঘবদ্ধ, সুশৃঙ্খল আন্দোলনে রূপ দেওয়ার জন্য আমাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। যেখানে যখনই সম্ভাবনা দেখা দেবে, সেখানেই কমরেডরা উদ্যোগ নেবেন, ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করবেন না। এই আন্দোলনে অন্য দলের লোকজনও যদি আসে আমরা আপত্তি করব না, তাঁদেরও গ্রহণ করব। অন্য দলও যদি কোথাও জনগণের ন্যায্য দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে, আমরা তাতেও থাকব, না ডাকলেও যাব। এটা একটা ইমার্জেন্সি পিরিয়ড। আন্দোলনটা চাই। যারা যতদূর আন্দোলনে যেতে প্রস্তুত তাদের নিয়ে আমরা আন্দোলন করব। কিন্তু উদ্যোগটা আমাদের নিতে হবে। জনগণের দাবি-দাওয়া নিয়ে আমরা যাতে আন্দোলনে নামতে পারি এবং জনগণের উপর যে আক্রমণ হবে সে আক্রমণ যাতে মোকাবিলা করতে পারি, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-যুবক, মহিলা, নানা বৃত্তির সংগঠন— প্রত্যেককেই তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

এখানে আরও একটা জিনিস আমি বলতে চাই। গণতন্ত্রের যতটুকু ধ্বংসাবশেষ আজও বুর্জোয়া শাসকবর্গ মৌখিকভাবে হলেও বজায় রেখেছে, আগামী দিনে সেই গণতন্ত্রেরও লেশমাত্র থাকবে না। আরও নগ্ন ফ্যাসিবাদী আক্রমণ ঘটতে থাকবে এবং গণবিক্ষোভ দমনে সরকার আরও নিষ্ঠুর ভূমিকা নেবে, তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আরও দানবীয় আইন আসতে থাকবে— তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বিশ্বে উগ্র জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, সম্প্রদায়গত বিরোধ, আমাদের দেশে প্রাদেশিকতা, ধর্মীয় হানাহানি, জাত-পাতের লড়াই, আদিবাসী-অ-আদিবাসী বিরোধ ইত্যাদি যা যা দ্বন্দ্ব আছে, জনগণের ঐক্যকে ভাঙবার জন্য বুর্জোয়ারা সেগুলোকে প্রবলভাবে উস্কানি দেবে। এগুলির বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে এবং তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

এ ছাড়াও আজকের এই ঘরোয়া বৈঠকে কিছু কমরেড কয়েকটি বিষয় আমাকে

আলোচনা করতে বলেছেন। আদর্শগত চর্চার ওপর যে আমাদের দল খুব জোর দিচ্ছে, তার বিশেষ কারণ আছে। প্রথমত এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, আমরা প্রত্যেকেই এসেছি একটা পুঁজিবাদী সমাজ থেকে। ছোটবেলা থেকে আমরা যা কিছু শিক্ষা পেয়েছি, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, আমাদের বিচারধারা, আমাদের মনন জগৎ, আমাদের দুঃখ-বেদনাবোধ, চাওয়া-পাওয়া, স্নেহ-মায়া-মমতা-রাগ-ক্ষোভ-অভিমান যা কিছু— একটা অধঃপতিত পচাগলা বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা ও সামন্ততন্ত্রের আবর্জনাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। এগুলি হচ্ছে আমাদের অভ্যাসজাত শক্তি। অভ্যাসজাত শক্তি খুবই শক্তিশালী। বিচারবুদ্ধির থেকেও শক্তিশালী। এটা দেখা যায়, বুদ্ধি দিয়ে যা বুঝি, সেটা কিন্তু অনেক সময় মন মানতে চায় না। কারণ দীর্ঘদিনের চর্চার ফলে মজ্জায় মজ্জায় মিশে যাওয়া অভ্যাসজাত মননশক্তি প্রবলভাবে বাধা দেয়। ফলে যুক্তির সাথে মনের প্রবল দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত মন এবং দীর্ঘদিনের অভ্যাসজাত মনের প্রবল সংঘাত হয়। ঠিক করি, কাল থেকে ঠিক ভাবে চলব। কিন্তু কাল যখন আসে তখন আর হয় না। পরে করব বলে আপস করি। এ ভাবে কালের পর কাল চলে যায়, আর হয় না। যার জন্য কেউ কেউ অতি দুঃখে বলে, বুঝি কিন্তু পারি না। নিজের কাছে নিজেই হেরে গেলাম। এ ভাবে অনেক সম্ভাবনাময় কর্মীর সম্ভাবনা ব্যাহত হয়। তাই যখনই যুক্তি দিয়ে বুঝি, তখনই ক্রিয়া করতে হয়। মনে রাখতে হবে, বাইরের শত্রুর থেকেও নিজের ভেতরের শত্রু অনেক বেশি শক্তিশালী। ফলে কমিউনিস্ট হওয়ার সংগ্রাম খুবই কঠিন সংগ্রাম। আজকের দিনে তো আরও কঠিন সংগ্রাম। মার্কস-এঙ্গেলসের সময়ে, লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং-এর সময়ে সংগ্রাম, আর আজকের দিনের সংগ্রাম এক নয়— এটা কমরেড শিবদাস ঘোষ ধরতে পেরেছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের প্রত্যেকটি বক্তৃতায় পাবেন— নীতি-নৈতিকতার প্রশ্ন, চরিত্রের প্রশ্ন কত গুরুত্ব দিয়ে তিনি উত্থাপন করেছেন। মার্কস-এঙ্গেলস বা লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং-কে এ বিষয়ে এতটা গুরুত্ব দিতে হয়নি। একটা কথা তিনি বলেছিলেন, ধর্ম এক সময় যে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল এবং ধর্মীয় মূল্যবোধকে ভিত্তি করে যে উন্নত চরিত্র এসেছিল, সেই মূল্যবোধ সামন্ততন্ত্রের যুগেই শেষ হয়ে গেছে। পুঁজিবাদের প্রথম যুগে তার সামান্য কিছু অবশিষ্ট ছিল। আবার গোড়ার দিকে সামন্ততান্ত্রিক অ্যাবসোলিউট মালিকানার বিরুদ্ধে ব্যক্তিমাত্রেরই মালিকানার অধিকারের দাবি ছিল প্রগতিশীল। তাকে ভিত্তি করে ব্যক্তিস্বার্থ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তিবাদ ছিল প্রগতিশীল। এসবই এসেছিল ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী মালিকানার অধিকার আদায়ের স্বার্থে। মানুষ ঈশ্বরসৃষ্ট নয়, পার্থিব জগতের সৃষ্টি। ঈশ্বর বলে কিছু নেই, ঈশ্বরের বিধানের নামে কিছু চলতে পারে না। ফলে রাজা ও সামন্তপ্রভুকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে মান্যতা দেওয়া চলতে

পারে না। রাজা নয়, প্রজারাই ঠিক করবে শাসন কীভাবে চলবে। প্রজাদের নির্বাচিত সরকার শাসন করবে, তারও পরিবর্তন হবে নির্বাচনে। ধর্মগ্রন্থ নয়, যা যুক্তিসঙ্গত তাই সত্য। এইসব নিয়েই বুর্জোয়া মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এসেছিল।

গোড়াতে ব্যক্তিগত মালিকানার একটা সামাজিক স্বার্থের দিক ছিল। সমাজের উৎপাদনের অগ্রগতির স্বার্থেই কুটির শিল্পকে বৃহৎ শিল্পে পরিণত করার প্রয়োজন ছিল। তখন ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল প্রগতিশীল। সে যুগের স্লোগান ছিল সামাজিক স্বার্থ মুখ্য, ব্যক্তিস্বার্থ গৌণ। কিন্তু যখন অনিবার্য নিয়মেই ইতিহাসের গতিপথে পুঁজিবাদ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে গেল, ব্যক্তিবাদ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে গেল, তখন ব্যক্তিস্বার্থই মুখ্য এবং একমাত্র হয়ে গেল, ব্যক্তি চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে গেল, সামাজিক দায়বদ্ধতাচ্যুত হয়ে গেল। পুঁজিবাদের মূল লক্ষ্যই হল যেভাবেই হোক মুনাফা অর্জন করতে হবে। এখানে অন্য কোনও প্রশ্ন নেই। তেমনই ব্যক্তির ক্ষেত্রেও দাঁড়াল, যেভাবেই হোক আমার ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে হবে। এখানে কোনও সামাজিক দায়বদ্ধতা বা মূল্যবোধের প্রশ্ন নেই। এমনকী পারিবারিক দায়বদ্ধতাও অবলুপ্তপ্রায়। আর সামাজিক দায়বদ্ধতা না থাকলে কোনও মূল্যবোধ থাকে না। যে কোনও মূল্যবোধই গড়ে ওঠে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে ভিত্তি করে, সামাজিক স্বার্থকে ভিত্তি করে। ফলে পুঁজিবাদের অভ্যুত্থানের যুগে উপরিকাঠামো হিসাবে যে মানবতাবাদী মূল্যবোধ গড়ে উঠেছিল এই যুগে তা প্রায় অবলুপ্ত। এই যে অসহায় বৃদ্ধ বাবা-মায়ের দায়িত্ব সন্তান নিচ্ছে না, দরিদ্র ভাইবোন তো দূরের কথা, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে নিত্য অশান্তি, পারস্পরিক সন্দেহ-অবিশ্বাস, যখন তখন সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া, যুব সমাজের অনৈতিক বেপরোয়াভাব, চূড়ান্ত নৈতিক অধঃপতন, সেক্স নিয়ে নির্বিচারে ব্যাভিচার— এসবই হচ্ছে সমাজে কোনও মূল্যবোধ কাজ না করার ফল।

লেনিন যখন বিপ্লব করছেন, রাশিয়ায় তখন সামন্ততন্ত্রের প্রভাব ছিল, ধর্মীয় মূল্যবোধের কিছুটা অবশেষ ছিল এবং আপেক্ষিক অর্থে বুর্জোয়া মানবতাবাদের প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। কারণ পুঁজিবাদ সেখানে সবে গড়ে উঠছে। চীনে বিপ্লবের সময় পুঁজিবাদ প্রায় ক্ষুদ্র শিল্পের স্তরে ছিল। ওখানেও ধর্মীয় মূল্যবোধের কিছু প্রভাব ছিল এবং বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধের প্রগতিশীল ভূমিকা তো ছিলই। আর কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের স্তরে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী দল গড়ে তুলেছেন। ফলে তিনি বললেন, এ দেশে ধর্মীয় মূল্যবোধ শেষ হয়ে গেছে, মানবতাবাদী মূল্যবোধও নিঃশেষিত প্রায়। তার ফলে অন্যান্য উন্নত পুঁজিবাদী দেশের মতো এ দেশেও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে একটা শূন্যতা বিরাজ করছে। অন্য দিকে সর্বহারা নৈতিকতার প্রভাবও সমাজে বিস্তার লাভ করেনি। তিনি বলেছেন, এখান থেকেই এসেছে সাংস্কৃতিক সংকট, নীতি-নৈতিকতার সংকট। আমরা হচ্ছি এই অধঃপতিত

বুর্জোয়া সমাজের প্রোডাক্ট। আমরা যারা এই দলে যুক্ত হচ্ছি, তাদের এই কথাটা ভাল করে বুঝতে হবে। আর এই জন্যেই তিনি মূল্যবোধের উপরে, নৈতিকতার উপরে প্রায় প্রতি বক্তৃতায় এত গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। এই প্রয়োজনীয়তা রাশিয়া ও চীনে বিপ্লবের সময় এতটা দেখা যায়নি। সেখানে আপেক্ষিক অর্থে বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধ ও ব্যক্তিবাদই বিপ্লবের পক্ষে কাজ করে গেছে, অনেকটা আমাদের দেশের স্বদেশি আন্দোলনের যুগের মতো। কিন্তু বিপ্লব পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক স্টেবিলিটি অর্জনের যুগে এই ব্যক্তিবাদই সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদের রূপে সূক্ষ্ম ভাবে শক্তি সঞ্চয় করেছে, যেটা নেতৃত্ব ধরতে পারেননি। ফলে সময় মতো এর বিরুদ্ধে আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত সংগ্রাম করেননি। ব্যক্তিকে ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত করে সামাজিক স্বার্থের সাথে একাত্ম করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেননি। এই সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদই পরবর্তীকালে প্রতিবিপ্লবের অন্যতম শক্তি হিসাবে কাজ করেছে।

এসব আমরা কমরেড ঘোষের অমূল্য বিশ্লেষণ থেকে জানি। তাই তিনি সর্বহারা নৈতিকতার চরিত্র কী হবে এটা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, এই নৈতিকতা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে মুক্ত হওয়া নয়, নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তিজাত মানসিকতা ও সংস্কৃতি থেকে মুক্ত হয়ে সর্বহারা বিপ্লব ও সর্বহারা দলের সাথে একাত্মতা গড়ে তোলার সংগ্রাম। তিনি খুবই গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন মার্কসবাদেরও মর্মশক্তি নিহিত রয়েছে উন্নত নৈতিকতার মধ্যে। এমনও বলেছেন, মার্কসবাদ যদি উন্নততর নৈতিকতার সন্ধান না দিত আমি মার্কসবাদকে গ্রহণ করতাম না। মনে রাখতে হবে, কমিউনিস্ট নৈতিকতা অর্জন, মূল্যবোধ অর্জন অত্যন্ত কঠিন সংগ্রাম। যদি আমার মধ্যে কোনও মূল্যবোধ অর্থাৎ ধর্মীয় মূল্যবোধ বা বুর্জোয়া মানবতাবাদ কাজ করত, তা হলে আলোচনা ও যুক্তির দ্বারা তার থেকে মুক্ত হয়ে সর্বহারা মূল্যবোধ অর্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হত। কিন্তু যখন আমার মধ্যে কোনও মূল্যবোধই নেই, মূল্যবোধের কার্যকারিতার প্রয়োজনবোধই নেই, তখন আমার পক্ষে সর্বহারা মূল্যবোধ অর্জন করা খুবই কঠিন। সেজন্যই তিনি বারবার বলেছেন, আগে নবজাগরণ ও স্বদেশি আন্দোলনের যুগের, বিশেষভাবে সেই যুগের আপসহীন ধারা থেকে মানবতাবাদী মূল্যবোধ অর্জন কর, তারপর শ্রেণিসংগ্রামের পথে সেই স্তর অতিক্রম করে সর্বহারা সংস্কৃতি অর্জন করতে হবে। ফলে এই সংস্কৃতি অর্জনের জন্য কঠোর সংগ্রাম চালাতে হবে, চালাতে হবে নিরন্তর সংগ্রাম। আবার দেখিয়েছেন, সতর্ক থেকে নিরন্তর সংগ্রাম না চালালে, এক সময়ের অর্জিত উন্নত মানও পরিবেশের আক্রমণে নেমে যায়। আর সে সংগ্রাম আমার সাথে আমারই লড়াই। আমি যেমন যুক্তি দিয়ে, খানিকটা আবেগ দিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে গ্রহণ করছি, তেমনই

আবার আমার মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণিশত্রু হাড়ে-মজ্জায় মিশে আছে। আর বাইরের শ্রেণিশত্রুও প্রবল শক্তিতে আছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়ে গেছেন, এই পরিবেশে ছোটবেলা থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গি, মন, আচার-বিচার, চাওয়া-পাওয়া, ভাল-মন্দ বোধ, অভ্যাস আমার মধ্যে গড়ে উঠেছে।

তা হলে দেখতে হবে, আমার মধ্যে আমার যে দৃষ্টিভঙ্গি, আমার যে বিচার, আমার চাওয়া-পাওয়া, আমার আচার-আচরণ এটা কি শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবের স্বার্থে হচ্ছে, এটা কি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা অনুযায়ী হচ্ছে? আমার এই দুঃখটা, আমার এই আনন্দটা, আমার এই ভালবাসাটা, আমার এই রাগটা, আমার এই অভিমানটা— এর শ্রেণিচরিত্র কী? এগুলিরও তো শ্রেণিচরিত্র আছে। এগুলো আমি বুঝব কী দিয়ে? এই দৃষ্টিভঙ্গি আমরা কোথা থেকে পাব? এই দৃষ্টিভঙ্গি পেতে হলে আমাদের মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা, তারই যুগোপযোগী উন্নত ব্যাখ্যা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাগুলি পড়তে হবে জানতে হবে। প্রথমে পড়তে হবে— কিন্তু শুধু পড়লেই হবে না, হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। কারণ একটা হচ্ছে জানা, আর একটা উপলব্ধি করা। দুটো এক নয়। টু নো অ্যান্ড টু রিয়ালাইজ আর ডিফারেন্ট থিংস। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, যে পড়তে জানে, ইংরেজি জানে, কয়েক মাসে সে মার্কসবাদের সব বই মুখস্থ করতে পারে, পণ্ডিত হতে পারে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতাদের অধঃপতন হল কেন? তাঁরা তো মার্কসবাদের পণ্ডিত ছিলেন! কাউটস্কি, প্লেখানভ এঁদেরই তো ছাত্র ছিলেন লেনিন। আবার লেনিনকেই মার্কসবাদের বিপ্লবী সত্তা রক্ষার জন্য এঁদের বিরুদ্ধে তত্ত্বগত সংগ্রাম করতে হয়েছে। ট্রটস্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ বা লি সাও চি, তেং সিয়াও পিং, এঁরা কি শত্রুপক্ষের এজেন্ট হিসাবে পার্টিতে এসেছিলেন? কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, না। আসলে এঁরা মার্কসবাদকে জীবনে প্রয়োগ করতে পারেননি। মানবেন্দ্র নাথ রায়ের দৃষ্টান্ত দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ আলোচনা করে গেছেন। এম এন রায় সম্পর্কে আমাদের এখনকার অনেকে ভাল করে জানে না। একসময় ভারতে এম এন রায় একজন নামকরা ইনটেলেকচুয়াল ছিলেন। তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। লেনিন তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার জন্য। সেই এম এন রায় পরবর্তীকালে ঘোরতর মার্কসবাদ বিরোধী হয়ে গেলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই পড়েছেন তিনি, কিন্তু দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে তা তিনি সংযোজিত করতে পারেননি। ফলে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বুঝতে পারেননি। যার ফলে তাঁর চিন্তা, অভ্যাস, আচরণ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সঙ্গত কি না, বিপ্লবের পরিপূরক কি না, এসব বিচার করে তিনি বিপ্লব ও বিপ্লবী দলের সাথে একাত্ম হতে পারেননি। এইখানেই তাঁর ব্যর্থতা। এই জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার বলেছেন, উন্নত চরিত্র অর্জন না

করলে তুমি কখনও বিপ্লবী তত্ত্বও বুঝবে না। আর উন্নত চরিত্র অর্জন করতে হলে গণআন্দোলন ও শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তোলার সাথে সাথে ব্যক্তিবাদের যে নানা রূপ, তা থেকে নিজেকে মুক্ত হতে হবে। বিভিন্ন ভাবে যে ব্যক্তিবাদ আক্রমণ করছে, বুর্জোয়া চিন্তা আক্রমণ করছে, বুর্জোয়া সংস্কৃতি আক্রমণ করছে— এর সাথে সর্বহারা রুচি সংস্কৃতি, সর্বহারা দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য কোথায় তা বুঝতে হবে। আমার মধ্যে যে বুর্জোয়া আক্রমণ হচ্ছে, বুর্জোয়া সংস্কৃতি, ব্যক্তিবাদী ঝোঁক, ব্যক্তিবাদী স্বার্থ থেকে এইসব চিন্তা আসছে এইসব ধরতে পারা, বুঝতে পারা এবং বুঝতে পেরে তা থকে মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম চালাতে হবে। এর থেকে মুক্ত হতে না পারলে আদর্শের কথাগুলো কেবল ভাষা হিসাবে থাকবে, কোনও প্রাণ থাকবে না, জীবন্ত হবে না। আমিও চরিত্র অর্জন করতে পারব না, অন্য কাউকেও চরিত্র অর্জনে সাহায্য করতে পারব না। প্রাণই নতুন প্রাণের জন্ম দেয়, প্রাণবন্ত চরিত্রই অপরকে জীবন্ত চরিত্র অর্জনে অনুপ্রাণিত করে। সেইজন্য কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, শুধু পড়লেই হবে না, শুধু কাজ করলেই হবে না, দু'টোকে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় সংযোজিত করতে হবে এবং সংযোজনের মধ্য দিয়ে তুমি যখন উন্নত সংস্কৃতি অর্জন করবে, তখনই তুমি তত্ত্ব বিচার করতে পারবে। থিওরিকে কংক্রিটলি প্র্যাকটিসের মধ্যে যাচাই করতে পারবে, অ্যাপ্লাই করতে পারবে। সেজন্য উন্নত সংস্কৃতির উপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। এই কথাটা কমরেডদের বুঝতে হবে।

ফলে পড়ার একটা দিক হচ্ছে পুঁজিবাদ কী, সাম্রাজ্যবাদ কী, সমাজতন্ত্র কী, সর্বহারা বিপ্লব কী ভাবে করতে হবে, সংগঠন কী ভাবে করতে হবে, শ্রমিকের সমস্যা কী, কৃষকের সমস্যা কী, বুর্জোয়ারা কী ভাবে আক্রমণ করছে— এসব জানা। আর একটা দিক হচ্ছে, দ্বন্দ্বমূলক বিচারধারা— যেটাকে ওয়ান প্রসেস অফ থিঙ্কিং বলে, সেটা জানা। সেই প্রসেসে চিন্তা করার ক্ষমতা অর্জন করা। কেন সত্য জানতে হলে মার্কসবাদকে জানতে হবে? মার্কসবাদের সাথে ভাববাদের পার্থক্য কোথায়? মৌলিকভাবে অন্যান্য দেশের মতো এক হলেও আমাদের দেশে ভাববাদের বিশেষ বিশ্লেষণ কী কী? এ সবের বিরুদ্ধে মার্কসবাদের বক্তব্য কী, কেন সত্যানুসন্ধানে এসব বক্তব্য গ্রহণ করতে হবে— এইগুলি বিশেষভাবে জানতে হলে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা জানতে হবে। যিনি মহান মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুং-এর ছাত্র হিসাবে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আরও উন্নত ও বিকশিত করেছেন। যথার্থ মার্কসবাদী পদ্ধতিতে চিন্তা করতে না পারলে ইউনিফরমিটি অফ থিঙ্কিং আসবে না। মেডিকেল সায়েন্সের একটা প্রসেস অফ থিঙ্কিং আছে। চিকিৎসকরা সেই প্রসেসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, রোগ নির্ধারণ করে। আবার পার্টিকুলার রোগের ক্ষেত্রে জেনারেল মেডিকেল সায়েন্সকে পার্টিকুলারলি প্রয়োগ করতে হয়। এখানে জেনারেল ও পার্টিকুলারের পার্থক্য আছে।

এগ্রিকালচারাল সায়েন্সের ক্ষেত্রেও একইভাবে কাজ করে। ফিলজফিটাও একটা জেনারেল প্রসেস অফ থিঙ্কিং, এরও পার্টিকুলারাইজেশন আছে। প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক পরিস্থিতিতে মার্কসবাদী বিজ্ঞান হুবহু একইভাবে প্রয়োগ হতে পারে না। তাকে কংক্রিট পরিস্থিতি অনুযায়ী কংক্রিটাইজ বা বিশেষীকৃত করতে হয়। এই সৃজনশীলতা মার্কসবাদের সঠিক উপলব্ধি ও উন্নত সংস্কৃতি অর্জন ছাড়া আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

এখানে একটি বিষয় বোঝা দরকার। ওয়ান প্রসেস অফ থিঙ্কিং প্রয়োগ করে ইউনিফর্মিটি অফ থিঙ্কিং এবং ওয়াননেস ইন অ্যাপ্রোচ আয়ত্ত করাকে কি রেজিমেন্টেশন অফ থট বলা চলে? বুর্জোয়ারা মার্কসবাদের বিরুদ্ধে এই অপপ্রচারই চালায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক যেকোনও বিষয় অর্থাৎ অ্যাটম, ইলেকট্রন বা পজিট্রন সম্পর্কে যখন একই সিদ্ধান্তে আসেন, বা চিকিৎসকরা যখন চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রয়োগ করে যে কোনও রোগ সম্পর্কে এক সিদ্ধান্তে আসেন, সেটাকে কি চিন্তার রেজিমেন্টেশন বলা চলে? নিশ্চয়ই নয়। তেমনই মার্কসবাদও যেহেতু বিজ্ঞান ও তা সঠিক প্রয়োগের ভিত্তিতে যে কোনও সিদ্ধান্তকে রেজিমেন্টেশন বলা চলে না।

আরেকটা বিষয় হল, সব কিছু পরিবর্তনশীল। আমরা চাই বা না চাই বস্তুজগৎ, প্রকৃতিজগৎ, সমাজজীবন সর্বদা পরিবর্তিত হচ্ছে। আবার সব পরিবর্তনই কোনও বিশেষ নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা গভর্নড হচ্ছে। এটা আমাদের ইচ্ছানুযায়ী ঘটে না। বিশেষ পরিবর্তনের বিশেষ নিয়ম আছে। আবার প্রত্যেকটির মধ্যে— একটা ক্ষুদ্র ইলেকট্রন থেকে শুরু করে যে কোনও বৃহৎ গ্রহ, যে কোনও সমাজজীবন, যে কোনও ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরবিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব, ইউনিটি অ্যান্ড স্ট্রাগল বিটুইন দি অপোজিট ফোর্সেস-এর দ্বন্দ্ব অবিরাম চলছে। এই দ্বন্দ্বের থেকে গতির সঞ্চার হয়। এটা বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দর্শন মার্কসবাদ দেখিয়েছে। ফলে যে কোনও ক্ষেত্রে ইউনিটি অ্যান্ড স্ট্রাগল বিটুইন দি অপোজিট ফোর্সেস কী ভাবে কাজ করছে, এই অপোজিট ফোর্সেস-এর মধ্যে সমাজের ক্ষেত্রে কোনটা প্রগতিশীল, কোনটা প্রতিক্রিয়াশীল তা নির্ধারণ করা, নিরন্তর গতির মধ্যে পরিবর্তনটা কোন স্তরে আছে, সেটা কোয়ান্টিটেটিভ না কোয়ালিটেটিভ, একটা বিশেষ পরিবর্তনকে আর একটা বিশেষ পরিবর্তন কীভাবে নিগেট করে যাচ্ছে— এই যে থ্রি প্রিন্সিপলস্ অফ ডায়ালেক্টিকাল মেটিরিয়ালিজম, ইউনিটি অ্যান্ড স্ট্রাগল বিটুইন দি অপোজিট ফোর্সেস, কোয়ান্টিটেটিভ চেঞ্জ টু কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ অ্যান্ড ভাইসি-ভার্সা, নিগেশন অফ নিগেশন— এগুলি ভাল করে বুঝতে হবে। তা ছাড়াও বুঝতে হবে কন্ট্রাডিকশনের মধ্যে কোনটা অ্যান্টাগনিস্টিক, কোনটা নন-অ্যান্টাগনিস্টিক। এক্সটারনাল কন্ট্রাডিকশন কী কী, ইন্টারনাল কন্ট্রাডিকশন কী কী। তার মধ্যে কোনটা একটা

বিশেষ সময়ে ডমিনেট করে। প্রিন্সিপাল কন্ট্রাডিকশন এবং প্রিন্সিপাল অ্যাসপেক্ট অফ কন্ট্রাডিকশন কী— এসব ফিলজফির প্রশ্ন আমি এখানে ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি না। শুধু বলতে চাইছি, মার্কসবাদ বুঝতে হলে বুঝতে হবে কীভাবে একটা ফেনোমেনন-এর মধ্যে এই সাধারণ নিয়মগুলি বিশেষ ভাবে ক্রিয়া করছে। সেটা বুঝেই বিচার-বিশ্লেষণ ও ক্রিয়া করতে হবে।

মনে রাখবেন, যে কোনও যুগে যে কোনও দর্শন, যে কোনও মতাদর্শ কোনও ব্যক্তিবিশেষ চেয়েছে বলে আসেনি। ইতিহাসের একটা বিশেষ যুগে, একটা বিশেষ সামাজিক মেটেরিয়াল কন্ডিশনে বিশেষ সামাজিক প্রয়োজনে এগুলি এসেছে। ব্যক্তিবিশেষের মাধ্যমে সেই সামাজিক চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে ব্যক্তিকরণের প্রক্রিয়ায়। মার্কসবাদও একইভাবে ইতিহাসের প্রয়োজনে এসেছে। একদিকে সমাজজীবনে পুঁজিবাদ ও শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব ও অন্য দিকে আধুনিক বিজ্ঞানের ব্যাপক অগ্রগতি— এই মেটেরিয়াল কন্ডিশনে শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি সন্ধানে মার্কস আধুনিক বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করেছিলেন। ফলে মার্কসবাদ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন। বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখা— কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, বায়োলজি, জিওগ্রাফি, ইকনমিক্স ইত্যাদির আবিষ্কৃত বিশেষ নিয়মগুলিকে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় কো-অর্ডিনেট, কো-রিলেট করে জেনারালাইজেশনের পথেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সাধারণ নিয়মগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে, যে নিয়মগুলি প্রতিটি বিশেষ ক্ষেত্রের গতিধারায় বিশেষ নিয়মের ক্ষেত্রে বিশেষরূপে ক্রিয়াশীল। বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কারের সাথে এবং শ্রেণিসংগ্রাম ও সমাজের অগ্রগতির নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে মার্কসবাদেরও বিকাশ ঘটে, উপলব্ধি উন্নততর হতে থাকে। ফলে যে কোনও জিনিস যখন একজামিন করছি, একটা কমরেডকে যখন বিচার করছি, একটা ফেনোমেনন বিচার করছি, একটা সমস্যাকে যখন বিচার করছি, যে কোনও প্রবলেমকে বিচার করছি— ন্যাচারাল প্রবলেম হোক, সোশ্যাল প্রবলেম হোক, পলিটিক্যাল প্রবলেম হোক, অর্গানাইজেশনাল প্রবলেম হোক— এই প্রিন্সিপলগুলিকে অ্যাপ্লাই করে আমি বিচার করি। এই প্রিন্সিপলগুলিও অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ফর্মে থাকে না, কংক্রিট ফর্মে থাকে। ফলে দর্শনগত দিক থেকে এই বিচারধারাকে আয়ত্ত করতে হবে। সাধারণভাবে আমরা জানি, পড়ি কিন্তু কোনও প্রবলেমকে যখন একজামিন করি তখন আমরা এগুলো প্রয়োগ করবার কথা ভাবি না বা বুঝি না বা পারি না। তার ফলে মুষ্টিমেয় পার্টি নেতার উপর নির্ভর করে বিচারটা কী হবে। সমস্ত স্তরে বা অধিকাংশ কমরেড এ ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে না। এই যে আমি কিছু অ্যানালিসিস করলাম— বর্তমান পরিস্থিতিতে কী কী ঘটছে, কী কী ঘটতে পারে, আমি তো আমার উপলব্ধি মতো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা অনুযায়ী যা দেখেছি, বিচার করেছি, একটা প্রসেস অফ থিঙ্কিং-কে অ্যাপ্লাই করেই তো করেছি? যদি এটা

আরও বহু কমরেড করে এবং তার ফলে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয় তাতে পার্টির চিন্তা আরও উন্নত হয়। তাছাড়া এটা না হলে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কও পার্টির মধ্যে গড়ে উঠবে না। তা ছাড়া আমার বক্তব্য ঠিক কি বেঠিক বুঝবেন কী করে? এর ফলে আমরা চাই বা না চাই যান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। একটা হচ্ছে বিচারধারা, আর একটা বিষয় হচ্ছে, কোনও একটা বিষয়ে বিচার করে কোনও সিদ্ধান্তে আসা। এটা হচ্ছে ওয়ান প্রসেস অফ থিঙ্কিংকে অ্যাপ্লাই করে একটা ইউনিফর্মিটি অফ থিঙ্কিংয়ে পৌঁছনো। পুঁজিবাদ সম্পর্কে গোটা বিশ্বে কমরেডদের একটাই ব্যাখ্যা। ক্ষুদ্র পুঁজি সম্পর্কে, সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে একটাই ব্যাখ্যা। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিচার একটাই, গান্ধীজি সম্পর্কে বিচার একটাই, সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটল কেন— বিচার একটাই। এটা হচ্ছে ইউনিফর্মিটি অফ থিঙ্কিং। এই ইউনিফর্মিটি অফ থিঙ্কিং-এর ভিত্তিতে যে ক্রিয়া আমরা করছি সে ক্রিয়ার মধ্যে একটা ঐক্য থাকে। এটাই হচ্ছে ওয়াননেস ইন অ্যাপ্রোচ। অ্যাপ্রোচ যে করছি, তার মধ্যে একটা ঐক্য থাকে। তা হলে এই যে পড়াশুনাগুলি করা তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সব ক্ষমতা অর্জন করা। তার ফলে দলের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটা জীবন্ত থাকবে এবং জীবন্ত থাকলে দলে নেতা বিপথগামী হলেও কর্মীরা গার্ড করতে পারবে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে, চীনে কর্মীরা পারল না কেন? যদিও তারা ঐতিহাসিক সংগ্রাম করেছিল, বিপ্লব জয়যুক্ত করেছিল, তাদের থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। তাদের সফলতা ও ব্যর্থতা থেকে শেখার আছে। কিন্তু তারা প্রতিবিপ্লবের বিপদ ধরতে পারেনি। এটা ছদ্মবেশে এসেছিল। তাদের মধ্যে আত্মসন্তুষ্টি এসেছিল। সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন পরবর্তী সমস্যাগুলি তারা বিচার করতে পারেনি। তাদের আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের জন্য সংগ্রাম করেনি এবং এমনকি এই সম্পর্কে স্ট্যালিন ও মাও সে-তুংয়ের আবেদনে সাড়া দিতে পারেনি। এই জন্য তাদের চেতনা ও সংস্কৃতির মান নিচু ছিল। ফলে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে, মাও সে-তুং এর মৃত্যুর পরে যারা নেতৃত্বে এল তারা যেদিকে নিয়ে গেছে দলও সেদিকে চলে গেছে। অন্ধতার জন্য, নিম্নস্তরের চেতনার জন্য সাধারণ কর্মী, সমর্থক ও জনগণ ধরতে পারেনি যে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জিন্দাবাদ করতে করতেই সংশোধনবাদীরা, প্রতিবিপ্লবীরা কী ভাবে সমাজতন্ত্রের ধ্বংসের জন্য ষড়যন্ত্র করেছে। ফলে চিন্তা ও সংস্কৃতিগত মান উন্নত না হলে অন্ধ আনুগত্য গড়ে ওঠে, না হলে অন্ধ বিরোধিতা হয়— দুটিই ক্ষতিকারক। আর এর ফলে দলের মধ্যে সংশোধনবাদ মাথা চাড়া দিতে পারে, দলকে বিপথগামী করতে পারে, পার্টির শ্রেণিচরিত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

তা হলে কমরেডরা পড়াশোনা করবে কেন? করবে, একটা হচ্ছে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি, বিচারধারা যাতে ঠিক থাকে, নিজের চিন্তাভাবনাগুলি ঠিক কি না যাতে

বুঝতে পারে। নেতৃত্বের অধঃপতন হলে যাতে বুঝতে পারে, বিরুদ্ধতা করতে পারে, দলকে রক্ষা করতে পারে। কী রকম ও কী ভাবে বুর্জোয়া আক্রমণ হচ্ছে আমার মধ্যে, যাতে তা ধরতে পারি। আবার আমি যা মনে করছি, তা ঠিক কি না কমরেডদের সাথে আলোচনা করে নেওয়া, যাকে বলে কনস্ট্যান্ট কমন ডিসকাশন, নেতৃত্বের সাহায্য নিয়ে তা করা। এটা এই জন্য দরকার যাতে নিজের মনে হওয়া ঠিক কি না, তা যাচাই করে নেওয়া যায় আর কনভিকশনটা দৃঢ় হয়। আমরা জিতব, আমরা পারব, আমরা যা বুঝছি, তা সত্য, সেটাই সঠিক— এই উপলব্ধি দৃঢ় হয়। তাছাড়া, বিরুদ্ধ শক্তিকে ফাইট করতে হলে, তারা যে মিথ্যা বোঝাচ্ছে, বিভ্রান্ত করছে, মানুষকে বিপথগামী করছে— তার যথাযথ উত্তর দিয়ে তাদের আমরা যাতে ডিফিট করতে পারি, আবার জনগণকে বিভ্রান্তির থেকে মুক্ত করে বিপ্লবের পক্ষে আনতে পারি, এইসব কারণেও পড়াশোনা করা দরকার।

এখানে মনে রাখা দরকার, সেন্টারে একত্রে থাকা নিছক থাকা-খাওয়ার সুবিধার জন্য নয়। এখানে কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাসোসিয়েশন, কনস্ট্যান্ট কমন ডিসকাশন-এর খুব সুযোগ থাকে, যদি একে ব্যবহার করা হয়। এখানে এক স্থানে থাকা-খাওয়া-শোওয়া আছে। এর ফলে ব্যাপক এক্সচেঞ্জ অফ ওপিনিয়নের সুযোগ আছে। একে অপরকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ আছে। অপরের গুণ থেকে, চরিত্র থেকে, অভিজ্ঞতা থেকে শেখার সুযোগ আছে। আবার অপরের ত্রুটি দেখা গেলে তাকে কমরেড হিসাবে ভালবেসে সাহায্য করার, ত্রুটিমুক্ত করার সুযোগ আছে। এখানে কার মধ্যে কী ধরনের ব্যক্তিবাদী ঝোঁক আছে, স্বামী-স্ত্রী-সন্তানের প্রশ্নে কোথায় অতি সূক্ষ্মভাবে দুর্বলতা কাজ করছে, জানিত-অজানিতভাবে কাজ করছে, আত্মসমালোচনার মানসিকতা আছে কি না, অপরের সমালোচনা খুশি মনে নিতে পারে কি না, সমালোচনা সঠিক হলেও তার মধ্যে অন্য কোনও বিদ্বেষ কাজ করছে কি না— এসব নানা খুঁটিনাটি জিনিস দেখা যায়। দেখে একে অপরকে কমরেড হিসাবে ত্রুটিমুক্ত হতে সাহায্য করা যায়। কে সেন্টারের কাজ খুশি মনে স্বেচ্ছায় করে, কে শরীর খারাপ বা বাইরে কাজ আছে এই অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে যায়। কাকে কাজের কথা বললে করে, আর কাকে না বললেও করে নিজের দায়িত্ববোধ থেকে— এই সব নিয়েই চরিত্র গঠন হয়। ফলে অন্যান্য পার্টি বডি যেমন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেন্টার লাইফ অন্য দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা কালেকটিভ লাইফ গড়ে ওঠায় এবং চরিত্র গঠনে সাহায্য করে, যদি নেতৃত্ব ঠিকমত গাইড করে।

একটা প্রশ্ন উঠেছে ডেমোক্রেটিক সেন্ট্রালিজম সম্পর্কে। এ বিষয়ে আমি বিশদ আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি না। একটা কমিউনিস্ট পার্টিকে বলা হয় মনোলিথিক পার্টি। মস্তিষ্ক হচ্ছে কেন্দ্র। অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে চালায় এই মস্তিষ্ক। আবার মস্তিষ্ক অঙ্গ -প্রত্যঙ্গ ছাড়া ক্রিয়া করতে পারে না। দলের ক্ষেত্রে হুবহু এক নয়, পার্টি কর্মীরা

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়, প্রত্যেকের মস্তিষ্ক আছে। সেন্ট্রালিজম ছাড়া কোনও কাজ হয় না, একটা অ্যাটমেরও সেন্ট্রালিজম আছে। সব কিছুর একটা সেন্ট্রালিজম আছে। একটা সেলেরও সেন্ট্রালিজম আছে বডিতে। এখান থেকেই সেন্ট্রালিজমটা ফলো করে বিপ্লবী দল। কিন্তু সেটা প্রলেটারিয়ান ডেমোক্রেসির ভিত্তিতে সেন্ট্রালিজম। প্রলেটারিয়ান ডেমোক্রেসি হতেই পারে না যদি আমি উন্নত বৈপ্লবিক জ্ঞান এবং সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করতে না পারি। কমরেড শিবদাস ঘোষ পার্টি গঠন প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন, প্রথম দিকে যাঁরা উদ্যোগ নেন, তাঁরা বিশেষ দেশের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী মার্কসবাদের সঠিক উপলব্ধি কী হবে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে মার্কসবাদের প্রয়োগের ভিত্তিতে কী আদর্শগত তত্ত্ব, কী সর্বহারা সংস্কৃতি, কী সংগঠন প্রক্রিয়া ইত্যাদি গড়ে উঠবে এইসব নিয়ে ব্যাপক তত্ত্ব ও ক্রিয়ার সংগ্রাম চালিয়ে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে যখন যৌথজ্ঞান সৃষ্টি করতে সক্ষম হন এবং সেই যৌথজ্ঞান কোনও একজন নেতার মধ্য দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে ব্যক্ত হয়, অর্থাৎ যৌথজ্ঞান বিশেষীকৃত হয়, তখন বুঝতে হবে, ব্যক্তিবাদের অবসান ঘটিয়ে সর্বহারা গণতন্ত্র ও সর্বহারা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যৌথ নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে। এটাই হচ্ছে দল গঠনের প্রক্রিয়ায় আদর্শগত কেন্দ্রীকরণ। আর এর ভিত্তিতে দলে সাংগঠনিক কেন্দ্রীকরণ গড়ে তুলতে হয়। ফলে সঠিক মার্কসবাদী পদ্ধতিতে আদর্শগত কেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়াতেই প্রলেটারিয়ান ডেমোক্রেসির ভিত্তিতে সেন্ট্রালিজম গড়ে ওঠে। পার্টির সংবিধান এটাকেই প্রতিফলিত করে। ব্যক্তিবাদ প্রলেটারিয়ান ডেমোক্রেসির ক্ষেত্রে বাধা, এটা কমরেডদের বুঝতে হবে। সদিচ্ছা থাকলেও ব্যক্তিবাদ থেকে রাতারাতি আমরা সকলে মুক্ত হতে পারব— এটা আমার বক্তব্য নয়। কিন্তু, আমাদের কনশাস থাকতে হবে, অ্যালার্ট থাকতে হবে, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষানুযায়ী নিরন্তর সংগ্রাম চালাতে হবে। কেন না, ব্যক্তিবাদ থাকলে দু'টি ঝোঁক থাকে। একটা হচ্ছে অন্ধ আনুগত্য গড়ে ওঠে, না হয় অন্ধ বিরোধিতা আসে, যেটা জন্ম দেয় আল্ট্রা ডেমোক্রেসির। আর ব্যক্তিবাদ থাকলে নেতৃত্বে যারা থাকে, তাদের মধ্যে থাকে কর্তৃত্ববাদ, অথরিটারিয়ানিজম বা ব্যুরোক্রেসি— অর্থাৎ আমি নেতা, আমিই সব থেকে ভাল বুঝি, আমি ঠিক বুঝি, আমি সিনিয়র, আমি আগে দলে এসেছি, ফলে তুমি বোঝার কে। এত ক্রুড ওয়েতে না হলেও এরকম চিন্তা আসে। প্রলেটারিয়ান ডেমোক্রেসির ভিত্তিতে যৌথজ্ঞান সেন্ট্রালাইজ করতে হয়। প্রলেটারিয়ান ডেমোক্রেসির ভিত্তিতে যে কোনও আইডিয়াকে সেন্ট্রালাইজ করার অর্থ হচ্ছে, একটা সেলের মধ্যে, একটা লোকালের মধ্যে, একটা প্রভিন্স বা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে, সেন্ট্রাল কমিটির মধ্যে বা একটা পার্টি কংগ্রেসে হোক বা একটা ফোরামে হোক, যে কোনও ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে যুক্তি-তর্ক করে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী চিন্তাকে প্রয়োগ করে সিদ্ধান্তে আসা। আবার যে কোনও

দ্বন্দ্ব মানেই দ্বান্দ্বিক নয়, তর্ক-বিতর্ক মানেই দ্বান্দ্বিক নয়। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করে তার থেকে নির্ধারিত যে ফর্মুলেশনগুলি পরীক্ষিত হয়ে গড়ে উঠেছে, কতকগুলি প্রেমিস আগের থেকেই অ্যাকসেপটেড হয়ে আছে, যেগুলি নিয়ে আমাদের মধ্যে নতুন করে আলোচনা করার দরকার নেই, সেগুলিকে ভিত্তি করে আলোচনা করা।

শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী দলের প্রয়োজন আছে, যৌথ নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে, এটা কি নতুন করে আলোচনা করতে হবে? আমরা প্রথম থেকেই, যখন দলে যুক্ত হই তখন থেকেই এগুলি বুঝে নিয়ে যুক্ত হই। যেমন সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সংশোধনবাদ, উগ্র হঠকারিতা, এগুলির বৈশিষ্ট্য কী কী— এগুলি নিয়ে রোজ রোজ আলোচনা দরকার হয় না। সর্বহারা বিপ্লবী দলের চরিত্র অনুযায়ী অথরিটি সম্পর্কে ধারণা, ডিসিপ্লিন সম্পর্কে ধারণা— এগুলি বুঝেই তো দলে এসেছি। কিন্তু একটা নতুন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে— কোনও একটা কাজ হোক, আন্দোলন হোক, কোনও কমরেডকে নিয়ে বিচার করব, কোনও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব একটা বডিতে বসে— এখানে যারা আলোচনার মধ্যে থাকবে, তারা যে যার উপলব্ধি অনুযায়ী আলোচনা রাখবে এবং প্রত্যেককে বলার জন্য যথেষ্ট সময় দিতে হবে। সকলেই মন দিয়ে শুনবে, বিচার করার জন্য, বিরুদ্ধতা করার জন্য নয়। তার ভিত্তিতে যে সত্য উদঘাটিত হবে, সেটা সকলকে সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেকের মন হবে, যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে সত্যটা কী উঠে আসছে এটা জানা। আমি কী বলছি সেটা গ্রহণ করাতে হবে, এটা নয়। এই ঝোঁক ব্যক্তিবাদী ঝোঁক। আমারটা গ্রহণ করতে হবে, আমারটা মানতে হবে, এটা নয়। সত্য যে-ই বলুক, সেটাই মানব। কারণ আমি সত্যানুসন্ধানী। আমারটা মানলে আমি খুব খুশি হয়ে গেলাম। আমারটা মানলে খুশি হওয়ার কী আছে? এটা কি আমার জয়? একটা সত্য আমার মাধ্যমে দলের শিক্ষানুযায়ী বিচারধারায় এল, অর্থাৎ আমি যে বিচারধারা পেয়েছি দল থেকে, সেটা ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছি, এই পর্যন্ত। এটা কি আমার ক্রেডিট? আর আমারটা গ্রহণ করা না হলে সেটা কি আমার ডিসক্রেডিট? যেমন করে ডাক্তাররা বসে মেডিক্যাল বোর্ডে বিচার করতে— এটা টিবি না টাইফয়েড। তখন মেডিকেল বিজ্ঞানে যা ধরা পড়ে সেটাই সবাই মানে। তখন কি ঝগড়া করে— না আমারটাই মানতে হবে? এক্সপেরিমেন্টে যা পাওয়া যাবে খুশি মনে মেনে নেবে সকলে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে প্রয়োগ করে যা সঠিক হিসাবে ধরা পড়বে, সে যে-ই বলুক— জুনিয়র কমরেড বলুক, সিনিয়রও বলুক, হাউস সেটাই গ্রহণ করবে। নেতৃত্ব সেটাকেই কার্যকরী করবে। একজন যে কথা বলছে, হয়ত আমিও একই কথা বলছি, কিন্তু উপলব্ধির ক্ষেত্রে, প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমি তার থেকে এগিয়ে, তাই আমি তার নেতা, যতক্ষণ আমার সে ক্ষমতা আছে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, কমরেডের ত্রুটি খোঁজা আমাদের কাজ নয়। কার কী কী ত্রুটি আছে তা দেখা আমাদের কাজ নয়। আমি দেখেছি, কোনও কমরেড যদি কারও ত্রুটি নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করতে যেতেন, তিনি তাঁকে প্রথমেই প্রশ্ন করতেন, তার কী কী গুণ আছে আগে বল। এটা আমিও ফলো করার চেষ্টা করি, কতটা পারছি কমরেডরা বিচার করবেন। কারণ বুর্জোয়া সমাজ থেকে আমরা যেটা পেয়েছি, আমি বড়, এটা জাহির করার ঝোঁক, আর ও কত ছোট এটা প্রমাণ করার ঝোঁক। আমাদের মধ্যে বুর্জোয়া কম্পিটিশন আছে, যেমন ব্যবসায়ীদের মধ্যে কার মাল বেশি বিক্রি হবে তার কম্পিটিশন আছে। তাই আমার প্রভাব বেশি, না ওর প্রভাব বেশি, ওর সুনাম বেশি না আমার সুনাম বেশি, কে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে— এই ধরনের টিপিক্যাল কম্পিটিশনও থাকে। এসব আমরা এই সমাজ থেকে পেয়েছি। এর জন্য আমাকে দায়ী করা উচিত নয়। আমি এই সমাজের রোগ বহন করছি। সেজন্য কমরেড ঘোষ কারও ত্রুটি খুঁজতে বলেননি। বলেছেন, পাবলিককে দেখ, কর্মীদের দেখ, নেতাকে দেখ, সব সময়েই দেখ তার কী গুণ আছে। চোখটা হবে গুণ দেখার। কারণ, তুমি তার কাছ থেকে শিখতে চাও। জীবন্ত মানুষের মধ্যেই জীবন্ত গুণ থাকে। ত্রুটি খুঁজবে কেন? তারপর আর এক জায়গায় বলছেন, তুমি গুণ খুঁজতে গেছ— কিছু কিছু ত্রুটি চোখে পড়েছে। কমরেডটির এই ত্রুটির জন্য তুমি ব্যথা পাবে— যদি তোমার দেখা ঠিক হয়। তোমার দেখাটা ঠিক কি না আগে বিচার কর। কোনও কমরেড সম্পর্কে একা রিডিং নেওয়া ঠিক নয়, এটাও তাঁর শিক্ষা। ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক রিডিং নেওয়া ঠিক নয়। হয় একটা ফোরাম রিডিং নেবে, না হয় কোনও বডি রিডিং নেবে, না হলে লিডারশিপ রিডিং নেবে— যে লিডারশিপ কালেকটিভ বডিকে রিপ্রেজেন্ট করে। নিজের মনে হওয়াটাকে সত্য হিসাবে নেবেন না। কমরেড ঘোষের মতো মানুষ বলছেন, দেখবেন 'বিপ্লবী কর্মীদের আচরণবিধি'র আলোচনায় দু'জায়গায় আছে, কোনও কর্মীকে সমালোচনা করতে গিয়ে তাঁর নিজের সম্পর্কেই বলছেন, প্রথমেই যাচাই করতেন, তাঁর কোনও ভুল হয়েছে কি না। অতবড় মানুষ এইভাবে বিচার করতেন। আর আমাদের মধ্যে— 'ও' এ-রকম, 'সে' ও-রকম— এই রকম ভাবার ও বলার প্রবণতা আকছার থাকে।

মনে রাখবেন, মানুষকে বোঝার জন্য কোনও ল্যাবরেটরি নেই। রোগ জানার ল্যাবরেটরি আছে, বস্তুকণা বোঝার যন্ত্র আছে, কিন্তু একজন মানুষকে যন্ত্রে ফেলে দিলাম আর বুঝে নিলাম, এরকমটা হয় না। এমনকি সাইকিয়াট্রিস্টরাও কখনও কখনও ফেল করে। সাইকোলজি একটা সায়েন্স ঠিকই, কিন্তু সবসময় সবটা বোঝা যায় না। সেখানে তার ইনডিভিজুয়াল রিডিং কাজ করে। তা হলে সঠিকটা বুঝতে হলে প্রয়োজন, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের গভীর উপলব্ধি, অনেক অভিজ্ঞতা এবং অত্যন্ত

উঁচু স্তরের নৈতিক মান ও নৈর্ব্যক্তিক মন, ইমপার্সোনাল অ্যাটিচিউড। আর যৌথ সিদ্ধান্তের কাছে হাসিমুখে নিজেকে সাবমিট করতে পারি কি না— এ রকম স্ট্যান্ডার্ড অর্জন। তা হলেও পাঁচজনের সাথে আমাকে বিচার করে নিতে হয়, মিলিয়ে নিতে হয়। আমি কমরেড ঘোষকে দেখেছি, কোনও কমরেড সম্পর্কে কিছু মনে হলে আমরা জুনিয়র, আমাদেরও প্রশ্ন করতেন— তোমাদের কী মনে হয়? অর্থাৎ তাঁর মনে হওয়া যাচাই করে নিতেন। যেগুলি আমাদের বলা চলে সে সব প্রশ্ন আমাদের সাথে আলোচনা করতেন। এই যে আমরা আকছার করি, আমার এই মনে হওয়া, ওই মনে হওয়া— এগুলো বুর্জোয়া অ্যাপ্রোচ। কারও প্রতি রাগ হয়েছে, ব্যবহারটা খারাপ করেছে, হয়ত খারাপই করেছে, তখনই তার বিচার করতে নেই। আগে রাগ মুক্ত হও, ক্ষোভ মুক্ত হও, তার পরে বিচার করবে শান্ত মনে— এটাও তাঁরই শিক্ষা। কেউ যদি খারাপ আচরণ করেও থাকে, পাল্টা প্রতিক্রিয়াটা বুর্জোয়া মানসিকতা। সে কমরেড সত্যি হয়ত খারাপ কিছু করেছে। তাতে তুমি দুঃখ পাবে এই ভেবে যে, আমার কমরেডটি খারাপ কাজ করছে, তাতে তো তার ক্ষতি হবে, দলের ক্ষতি হবে। ফলে তাকে ভালবেসে সাহায্য করতে হবে। মনে রাখবেন, যাকে ভালবাসি না, যার গুণের প্রশংসা করতে পারি না, যার সমালোচনা খুশি মনে গ্রহণ করতে পারি না, তার সমালোচনা করার আমার নৈতিক অধিকার নেই। এমন পর্যন্ত কমরেড ঘোষ বলেছেন, অপরকে বিচারের সময় নিজেকে তার জায়গায় রেখে বিচার করতে হয়। বলেছেন, তার জায়গায় থাকলে আমি কী করতাম? আমি যদি বাবা হতাম, মা হতাম, আমি যদি স্ত্রী হতাম, স্বামী হতাম, আমি যদি ভাই-বোন হতাম, তা হলে এই ক্ষেত্রে কী করতাম। তার স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে যদি আমি ওই কাজ করতাম, তা হলে কী করতাম? বলেছিলেন, তা না হলে বিচার ইমপারসোনাল হবে না। এভাবে নিজেকে প্লেস করে তার প্রবলেম বুঝতে হবে। আবার এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, সব সময় নিজের ত্রুটি, নিজের সীমাবদ্ধতা খুঁজবে। নিজের গুণের বিচার নিজে করবে না। কে কোথায় তোমার গুণের তারিফ করছে, সেদিকে কান দেবে না। তোমার কোনও গুণ থাকলে সেটা তো থাকবেই, কেউ স্বীকৃতি দিক আর না দিক। দেখতে হবে তোমার কোন গুণ নেই বা কোথায় তোমার ত্রুটি, কোথায় সীমাবদ্ধতা। কারণ তুমি তো এগোতে চাও, বড় হতে চাও। ত্রুটিমুক্ত না হলে, সীমাবদ্ধতা দূর না করলে এটা কী করে হবে? ফলে যে কেউ তোমার ত্রুটি দেখাক, তা ভালবেসে হোক বা রাগ করে হোক, এমনকি শত্রুতা থেকে হোক— তাতে সত্য থাকলে গ্রহণ করবে। এতে তুমি ত্রুটিমুক্ত হয়ে আরও বড় হবে। এতদূর পর্যন্ত বলেছেন— সেই সমালোচককে শিক্ষক হিসাবে গণ্য করবে।

আর বলেছেন, অপরের ত্রুটি নিয়ে খোঁচাখুচি করবে না। আবার প্রত্যেক কমরেডকে বলছেন, তোমার সামান্য ত্রুটি নিয়েও অত্যন্ত সতর্ক থাক। এগুলো

সব কমরেড ঘোষের বক্তব্য। আমরা সামনে থেকে তাঁর আচরণ দেখেছি। তিনি হাইলি এথিক্যাল ছিলেন। তিনি সুবোধ ব্যানার্জী স্মরণে বলেছেন, সুবোধ ব্যানার্জী বা এই স্তরের কেউ সামান্য ভুল করলেও আমি তীব্র সমালোচনা করি। কারণ তারা দলের স্তম্ভ। তাদের সামান্য ভুলে দলের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। আর তারা আমাকে দেখেছে, চিনেছে। তারা জানে, তাদের কল্যাণের জন্যই এগুলি বলি। কিন্তু জুনিয়র কমরেডদের ক্ষেত্রে এরকম করি না। আমি নিজে জানি একজন জুনিয়র কমরেডকে সঙ্গত কারণে তিনি রেগে ধমক দিয়েছিলেন। যখন দেখলেন সেই কমরেড মুখ কালো করে উঠে যাচ্ছেন, তখন তার পিছনে পিছনে গিয়ে তাকে বসিয়ে বলেছিলেন, আপনাকে এভাবে বলা আমার ঠিক হয়নি। এমন স্তরের এথিক্যাল মানুষ ছিলেন তিনি। প্রতিটি আচার আচরণের ক্ষেত্রে তিনি এই রকম এথিক্যাল ছিলেন।

আবার তিনি দেখিয়েছেন, দুর্বলতা আর ভালবাসা এক নয়। ওয়ার্নিং দিয়ে বলেছেন, ভালবাসা যেমন মানুষকে অনেক উপরে তোলে তেমন আবার নামিয়েও দেয়। যেখানে ভালবাসার মধ্যে আদর্শ, নীতি-নৈতিকতা কাজ করে না, কনভেনশনাল অ্যাপ্রোচ কাজ করে, যেখানে ভালবাসা দুর্বল করে, সেখানে অধঃপতন হয়। আবার যেখানে ভালবাসা আদর্শকে ভিত্তি করে, নীতি-নৈতিকতাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, সেখানে বলিষ্ঠতা দেয়, অপরকে উন্নত করে। তাই স্নেহ-মমতা-ভালবাসার ক্ষেত্রে চাই বিপ্লবী আদর্শ, নৈতিকতা ও বলিষ্ঠতা, দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। সন্তানের প্রশ্নে, স্বামী-স্ত্রীর প্রশ্নে, ভাই-বোনের প্রশ্নে, নানা প্রশ্নে এই সব ওয়ার্নিং তিনি দিয়ে গিয়েছেন। এ কথাও তিনি বলে গিয়েছেন, কোনও উন্নত স্তরেরই কোনও গ্যারান্টি নেই। তুমি যত উন্নত স্তরেই পৌঁছে থাক না কেন, সেটাই তোমার গ্যারান্টি নয়। তিনি বলতেন, আমারও গ্যারান্টি নেই। আমি যে কমিউনিস্ট, সেটা মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে। ফলে কেউ উন্নত স্তর যদি অর্জন করেও থাকে, বাইরে থেকে উই পোকার মতো বুর্জোয়া সংস্কৃতিও অভ্যাসের ভাইরাস হিসাবে সর্বক্ষণ আক্রমণ করছে। ফলে সব সময় সতর্ক থেকে নিজেকে সংগ্রাম করে রক্ষা করতে হয়।

এখন দলের কিছু কমরেডের মধ্যে একটা আত্মসন্তুষ্টির মানসিকতা কাজ করছে। যে সব দলের প্রতি একসময় জনগণের অন্ধ সমর্থন ছিল, ভরসা ছিল, সেই ঐক্যবদ্ধ সিপিআই, সিপিআইএম, নকশাল— এখন তাদের কাজকর্ম, হালচাল দেখে সেই আস্থা নেই, তারা এখন অনেকটা ডিসক্রেডিটেড। ফলে আমাদের দেখে পার্টির প্রশংসা বাড়ছে মানুষের মধ্যে, সাপোর্ট বাড়ছে। অল্প চেষ্টায় আমরা চাঁদাপত্র পাই। আগে নেতাদের খাওয়াই জুটত না, এখন তা নয়। অল্প চেষ্টাতেই কিছু লোকজন আসছে— এইসব নিয়ে আত্মসন্তুষ্টির মানসিকতা গড়ে উঠছে। এক সময়ে আমরা

ট্রেনে-বাসে-রাস্তায় যাকেই পেয়েছি, তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি, দলে টানার চেষ্টা করেছি। তখন সকলেই চেষ্টা করত ভাই, বোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে কীভাবে পার্টির সাথে যুক্ত করা যায়। আজ এই ভাবে পার্টির সাথে যুক্ত করার প্রচেষ্টাটা অনেকটাই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কারণ এমনিতেই বেশ কিছু লোকজন পাওয়া যাচ্ছে। আজ এখানে যে-সব কমরেডরা আছে তারা সকলেই বলতে পারবে ওদের গড়ে তোলার জন্য, রক্ষার জন্য নেতৃত্বের কী মেহনত আছে। সেই সময় শুধু আমি নয়, আমার সিনিয়ররা, আমরা সকলেই এভাবে একজন দু'জন করে লোকজন এনেছি। কী ভাবে পার্টিকে বাড়ানো যায়, এটাই ছিল আমাদের ধ্যানজ্ঞান। কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রথম জীবনে কোনও একজনকে পাওয়ার জন্য এমনকি মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন অভুক্ত অবস্থায়। আজ আমরা, আপনারা সকলে মিলে যদি আত্মসন্তুষ্টি বর্জন করে সেইভাবে কাজ করি, তা হলে দলের শক্তি আরও কত বাড়ানো যায়! প্রত্যেক কমরেড যদি মাসে কংক্রিট টার্গেট ও প্ল্যানিং নিয়ে কনসিসটেন্টলি অ্যাটেম্পট করে যায় যে, প্রতি মাসে এতজন নতুন যোগাযোগ বের করব, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলব, কোনও না কোনও ভাবে যুক্ত করব, তা হলে এটা সম্ভব। আপনারা ভেবে দেখবেন।

আমাদের যখন প্রশংসা করে— আপনাদের ব্যবহার খুব ভাল, আপনাদের বক্তব্য খুব ভাল, আপনারা খুব ভাল, আপনাদের দল খুব ভাল— এগুলি শুনে আমরা অনেকেই এই কথা বলি না, আমরা ভাল বলে আপনি যতটুকু মনে করছেন— এটা কোথা থেকে হলাম? বর্তমানের দূষিত পরিবেশে আমি তো খারাপ হয়ে যেতে পারতাম। আমার বক্তব্য ভাল হল কী করে? আমার মধ্যে ভাল যা কিছু দেখছেন এটা তো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ফল। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা একটা মহৎ আদর্শ। আজকের যুগে একমাত্র এই আদর্শই সে চরিত্র দিতে পারে, উন্নত বিশ্লেষণ উপস্থিত করতে পারে— এ বিষয়ে মানুষ জানবে কী করে, এ ভাবে আমরা যদি না বলি?

দ্বিতীয়ত, আর একটা আক্রমণ আসছে, তা হল কনজিউমারিজমের প্রভাব। এর প্রভাব সমাজেও প্রবল ভাবে পড়ছে। আরামে থাকা, আরামপ্রিয়তা— এসবের প্রভাব বেশ কিছু কমরেডের মধ্যে আসছে। এগুলি কমরেড শিবদাস ঘোষ অপছন্দ করতেন। এই সেন্টারে যদি তিনি থাকতেন, এই যে আমি বহু সময় অপ্রয়োজনে আলো জ্বলছে দেখলে নেভাই— আবার আমিও ভুল করি না তা নয়, আমিও কখনও কখনও ভুল করি— কিন্তু বহু সময় দরকার নেই, তাও আলো জ্বলতেই থাকে। এ তো পাবলিক মানি। কমরেড রণজিৎ ধরের স্মরণসভার বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম, তাঁকে কমরেড ঘোষ বকেছেন, সাবান বেশি খরচ করেছেন বলে। এই খাওয়ার ক্ষেত্রে, সাবানের ক্ষেত্রে, টুথব্রাশের ক্ষেত্রে, জামাকাপড়ের ক্ষেত্রে, একটা

হল মিনিমাম যা দরকার, সম্ভব হলে জোগাড় করব। আর একটা হল, আরও চাই। সবচেয়ে মডার্ন দামী জিনিস চাই, না পেলে মন খচখচ করে। আমার অজান্তে প্রচলিত সমাজের কনজিউমারিজমের প্রভাব যে পড়ছে, এগুলি খুব ক্ষতির সৃষ্টি করে। অনেকে দেয় পার্টি কমরেডদের। ওরা মনে করে, কমরেডরা কষ্টে আছে। কমরেডরাও নেয়। ভাবে, ক্ষতি কী? আমি তো পার্টির দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। এটা ঠিকই। কিন্তু অন্য দিকে বুর্জোয়া কনজিউমারিজমের ভিক্টিম হয়ে যাচ্ছি ধীরে ধীরে, এটা টের পাচ্ছি না। অনেক ক্ষতি আছে, যেটা মোটা চোখে ধরা পড়ে না, অতি সূক্ষ্মভাবে ঘটে। আর, এমন কী ক্ষতি হচ্ছে, এভাবে র‍্যাশানালাইজ করতে করতে আমরা প্রশ্রয় দিই। যখন বড় হয়ে ধরা পড়ে, তখন সামাল দেওয়া কঠিন হয়। আমরা যেমন খুঁজে খুঁজে ছেঁড়া জামাকাপড় পরে লোককে দেখাব না যে আমরা কত ত্যাগী, আবার সুযোগ থাকলেও আরাম-আয়েস, ভোগবিলাসকে প্রশ্রয় দেব না। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা কোথায়, ভাল করে বুঝতে হবে। মনে রাখবেন, বিপ্লবী হিসাবে আমাদের দীর্ঘদিন কারাগারে থাকতে হতে পারে, আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে হতে পারে, জঙ্গলে-পাহাড়ে থাকতে হতে পারে, আশ্রয় জুটবে না, খাবার জুটবে না— এমন পরিস্থিতি হতে পারে। তার জন্য জীবনযাত্রায় সব সময় নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হয়। কনজিউমারিজমের আরাম-আয়েশের ভিক্টিম হচ্ছি কি না, সব সময় লক্ষ রাখতে হয়। আমার অনেক শাড়ি আছে, জামা-প্যান্ট আছে, আর একজন কমরেডের জুটছে না, তার কথা ভাবি না। বা কাউকে দিলেও লাইকিং-এর ভিত্তিতে দিই। দেওয়ারও একটা ব্যক্তিগত অ্যাপ্রোচ আছে, লাইকিং থাকে।

আর একটা আক্রমণও জুনিয়রদের ক্ষেত্রে হচ্ছে। সেই সম্পর্কেও সতর্ক থাকা দরকার। নর-নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে আগে যতটুকু বাঁধন ছিল, রুচি-সংস্কৃতির বাঁধন ছিল, এটা ওপেন হয়ে গিয়েছে এখন, অত্যন্ত কুৎসিত রূপে, অতি নগ্ন ভাবে। তার প্রভাব আমাদের ছোটদের মধ্যে কিছুই পড়ছে না ভেবে নেগলেক্ট করা উচিত নয়। যৌবনে সেক্স একটা প্রবল শক্তি হিসাবে বারবার ধাক্কা দেয়। ঠিক মতো গাইডেন্স না পেলে অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ কর্মীর ক্ষতি হয়। মার্কসবাদী চিন্তানায়ক হিসাবে কমরেড শিবদাস ঘোষ এই সম্পর্কে মূল্যবান গাইডেন্স দিয়ে গেছেন। এই ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে, খুব বেশিই হতে পারে, কারণ সেক্স-এর দাবি খুবই শক্তিশালী। অতীতে সমাজে যখন মূল্যবোধের প্রভাব ছিল, তখনও এই শক্তিকে কন্ট্রোল করা কঠিন ছিল। আর এখন তো কোনও মূল্যবোধই কাজ করছে না। এ যেন একটা মাদকতা, যেন মদের নেশার মতো একটা নেশা হয়ে গ্রাস করছে। এটার মধ্যে রুচি-সংস্কৃতি কাজ করছে না, ভদ্রতা-শালীনতা কাজ করছে না। তাই এ ক্ষেত্রে কমরেড ঘোষের গাইডেন্স ভাল করে বুঝে ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে জুনিয়র কমরেডদের সাহায্য করতে হবে। কোনও ভুলভ্রান্তি ঘটলে খড়্গহস্ত হয়ে আক্রমণ নয়, আঘাত দিয়ে সমালোচনা

নয়, ধীর-স্থির-শান্ত ভাবে, ভালবেসে, ধৈর্য ও সহানুভূতির সাথে কমরেড ঘোষের শিক্ষানুযায়ী কংক্রিট ক্ষেত্রে কংক্রিটলি গাইড করতে হবে। জুনিয়র কমরেডদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে নেতৃত্বকে খুব সজাগ থাকতে হবে। ভালগার সেক্স-এর প্রভাব কী ভাবে কার উপরে পড়ছে এটা বুঝে ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে সাহায্য করতে হবে।

আরেকটা বিষয় আমি এখানে বলতে চাই। দলের সাথে, গণসংগঠন এবং ফোরামগুলির সাথে বহু শ্রমিক-কৃষক ঘরের সন্তান, দুঃস্থ নারী, গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন শিক্ষাবিদ-বুদ্ধিজীবী-বিজ্ঞানী-শিল্পী এবং বিশেষভাবে ছাত্র-যুবক যুক্ত হচ্ছে। রাজ্যে রাজ্যে বহু যোগাযোগ বের হচ্ছে। দলের দ্রুত বিস্তার ঘটছে। কিন্তু সেই অনুপাতে যোগ্যতাসম্পন্ন নেতা তৈরি হচ্ছে না। এখন যাঁরা বিভিন্ন স্তরের নেতা আছেন, তাঁদের অতি দ্রুত কমরেড ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে আদর্শগত, চরিত্রগত ও সাংগঠনিক ক্ষমতা অর্জন করতে হবে নবাগতদের গাইড করার জন্য। এটা খুব ভাল লক্ষণ যে, বেশ কিছু প্রতিভাবান ছাত্র-যুবক চাকরির মোহ, পারিবারিক আকর্ষণ ছেড়ে দলে যুক্ত হচ্ছেন। এদের প্রতি খুবই যত্নশীল হোন। এদের গুণাবলিকে বিকশিত করুন। স্বকীয় পরিকল্পনায়, নিজস্ব উদ্যোগে কাজ সৃষ্টি করতে দিন। কাজ করতে দিন, ভুল করলেও স্বকীয় উদ্যোগে কাজ করতে দিন। উৎসাহ দমিয়ে দেবেন না। কাউকে আঘাত দিয়ে সমালোচনা করবেন না, সযত্নে সস্নেহে ভুল শুধরে দিন। মনে রাখবেন, এরাই এই বিপ্লবী দলের ভবিষ্যৎ।

'মাস লাইফ ইজ আওয়ার মোড অফ লাইফ' হওয়া দরকার। এটা বেশিরভাগ নেতা ও কর্মী এখনও করতে পারেননি। এটা আমাদের দলের একটা বড় দুর্বলতা। যুক্তি দিয়ে বুঝলেও কিছুতেই অভ্যাসে আসছে না। জনগণের সাথে এই যে নাড়ির সম্পর্ক গড়ে উঠছে না, এতে যে শুধু দলের বিস্তার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাই নয়, কর্মীদের জনগণকে বোঝা এবং বোঝানোর দক্ষতা ও নিজেদের চরিত্রের মান গড়ে ওঠাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এটা ঊর্ধ্বতন নেতারাও বুঝতে পারছেন না। তাঁরা শুধুমাত্র রুটিন ওয়ার্কেই কর্মীদের ব্যস্ত রাখছেন। বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যমুখীনতা নিয়ে পাড়ায় আড্ডা দেওয়া, মেলামেশা, সামাজিক কাজকর্ম করা যে কত গুরুত্বপূর্ণ— এটা বুঝছেন না। যারা একসময় পাড়ায় মিশতে পারত, তারাও শুধুমাত্র রুটিন ওয়ার্কে ব্যস্ত থেকে মেলামেশার অভ্যাসটাও হারিয়ে ফেলছে। মেলামেশার দ্বারা পাবলিকের চিন্তাভাবনা, প্রশ্ন, বিভ্রান্তির বিষয়ে জানা যায়। গল্প, হাসিঠাট্টা দিয়েও অন্যকে আকৃষ্ট করা যায়। মনে রাখবেন, জনগণের কাছে যাওয়াটা শুধু প্রোগ্রামের জন্য যাওয়া নয়, কাগজ বিক্রি, চাঁদার জন্য যাওয়া নয়। আমরা ঘর ছেড়েছি মানুষকে ভালবেসে। বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি— এ তো কমরেড ঘোষেরই কথা। এই শোষিত মানুষকে ভালবাসি বলেই তো বিপ্লব চাই, তার জন্যই তো বিপ্লবী পার্টি চাই, তার জন্যই তো কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা চাই, যে কোনও অন্যায়-অত্যাচারের

বিরুদ্ধে লড়তে চাই। মানুষের সুখ-দুঃখের সাথে যদি যুক্ত না হলাম, না জানলাম, না বুঝলাম, তাহলে আমার সেই হৃদয়বৃত্তি কোথা থেকে আসবে? হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের সংযোগ না থাকলে, দুঃখ-ব্যথা-বেদনার অনুভূতি না থাকলে, এটা নিরন্তর সজীব না থাকলে হৃদয়বৃত্তি থাকে নাকি? ফলে উন্নত চরিত্রও অর্জন করা যায় না। যে পাড়ায় থাকি বা যেখানেই থাকি সেখানকার মানুষের সাথে মেলামেশাটাই আমার কাজ। তাদের বিপদে-আপদে থাকাটাই আমার কাজ। আবার তার মধ্যে দিয়ে মানুষকে পাল্টানো আমার কাজ। আবার জনগণের কাছ থেকেও শিখতে হবে আমাদের।

আবারও বলছি, সিনিয়ররা, সিনিয়রিটির কমপ্লেক্সে যেন সাফার না করে। জুনিয়ররা যারা বিকশিত হচ্ছে, যারা ক্ষমতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে, তাদের গুণকে রেসপেক্টের চোখে দেখতে হবে। তাদের প্রস্ফূটিত করতে হবে। সমালোচনার ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের কোড অফ কনডাক্টকে ফলো করতে হবে। আমি বড় বলে, আমি লিডার বলে যেমন তেমন করে বলতে পারি না। তার একটা নির্দিষ্ট আচরণপদ্ধতি আছে, রুচি-সংস্কৃতি আছে এবং জুনিয়ররা যেন নিঃসঙ্কোচে, নির্দ্বিধায় আমার যে কোনও ত্রুটি নিয়ে আমাকে বলতে পারে, এ দরজা আমাকেই খুলে দিতে হবে। আমাকে বলতে পারে না— এ ব্যাপারে জুনিয়রের ত্রুটি যতটা তার চেয়ে লিডার হিসাবে আমার ত্রুটি বেশি। আর আমাকে তোয়াজ করে, আমাকে খুশি করে, আমাকে ভয় করে, যার জন্য আমার প্রীতিভাজন— এটা কি স্ট্যান্ডার্ড? আমি ধমকাই, দাপট দেখাই, আমার ত্রুটি নিয়ে কেউ বলতে পারবে না, আমার সাথে কেউ তর্ক করতে পারবে না এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করেছি— এগুলি যেন না থাকে। ক্ষোভ, দুঃখ, বেদনা, রাগ— যা-ই আমার সম্পর্কে থাকুক, নির্দ্বিধায়, নিঃসঙ্কোচে ও নির্ভয়ে যেন আমাকেই বলতে পার। নেতা হিসাবে আমার ভুল হলে কৃতজ্ঞতার সাথে মেনে নেব। এখানেই আমার বড়ত্ব। আর তার ভুল হলে সযত্নে বুঝিয়ে দেব। ভুলে যাবেন না, কোনও কর্মী যদি সামনা-সামনি আমাকে সমালোচনা করতে ভয় পায়, সেটা আমার প্রতি অনাস্থা ও অশ্রদ্ধারই প্রকাশ। আমার সামনে বলা ভাল, নাকি পিছনে বলা ভাল? সেটা কি পার্টির পক্ষে স্বাস্থ্যকর হবে? নেতারা কর্মীদের জয় করবে পদের জোরে নয়। জয় করবে তার চরিত্র, ব্যবহার, জীবনযাত্রা, যোগ্যতা ও নেতৃত্বের গুণাবলির দ্বারা। আবার কোনও নেতা অন্তরায় সৃষ্টি করলেও জুনিয়র হিসাবে আমি মুখ খুলতে পারব না কেন? আমি কি সরকারি চাকরি করতে এসেছি যে উপরওয়ালার খারাপ নজরে পড়লে আমার চাকরি চলে যাবে? এজন্যই কি ঘরবাড়ি, কেরিয়ার ছেড়েছি? আমি কি কাওয়ার্ড? তা ছাড়া আলোচনা না করলে, কে ঠিক— এটা ঠিক হবে কী করে? এছাড়া মন খুলে আলোচনা না করতে পারলে মনও খচখচ করতে থাকবে, অন্য কাজেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে, ভাল করে মন দিতে

পারব না। তাই চেপে না রেখে সবসময় আলোচনা করে মন পরিষ্কার, স্বচ্ছ রাখতে হবে। একজন নেতার ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, আমি যাকে দলে যুক্ত করেছি, যাকে আমি লালন-পালন করেছি, সে একদিন আমার চেয়ে বড় হতে পারে। আমার ছেলে যদি আমার চেয়ে বড় হয় এটা কি আনন্দের নয়! পিতা হিসাবে আমার এখানেই সার্থকতা। ও সব সময়ে আমার চেয়ে পিছিয়ে থাকবে, এ কথা কে বলেছে? আবার জুনিয়ররাও সিনিয়রদের সবসময় রেসপেক্টের চোখে দেখবে, কথা বলবে। এটা মতপার্থক্য ব্যক্ত করার সময়, সমালোচনা করার সময়েও বজায় থাকবে। এমনকি এরকমও হতে পারে যে, আমাকে যিনি দলে যুক্ত করেছেন, তিনি এখন সক্রিয় নেই, বা একসময় আমার যিনি লিডার ছিলেন, আজ দল বিচার করে তার লিডিং বডিতে আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে, এই অবস্থাতেও তাঁদের প্রতি আমায় রেসপেক্ট রেখেই চলতে হবে। এটাই হবে আমার উন্নত কালচারের প্রতিফলন।

গণআন্দোলন, শ্রমিক-কৃষক সংগ্রাম, সামাজিক কাজকর্ম, সাংস্কৃতিক কাজকর্ম, আমরা বেশ কিছু করছি। কিন্তু এই কাজগুলির মধ্যে বিপ্লবী রাজনীতি কী ভাবে নিয়ে যেতে হবে, মার্কর্সবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা কী ভাবে নিয়ে যেতে হবে, এই জায়গাটাতে আজও বহু কমরেড ইকুইপড নয়। এটা তাদের শিখতে হবে, জানতে হবে এবং নেতাদের শেখাতে হবে। শুধু অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করছি, এ তো ইকনমিজম হল। লেনিন যেটাকে কনডেম করেছেন। অন্যরাও তো কিছু কিছু অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া তোলে। এখানে পার্থক্য কী থাকছে যদি বিপ্লবী রাজনীতি না দিতে পারি, শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি না নিয়ে যেতে পারি? বিপ্লবী রাজনীতি নিয়ে যেতে হবে এমন ভাবে যাতে সে বুঝতে পারে— নট ব্লান্টলি। মার্কসবাদ আপনাদের চর্চা করতে হবে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আপনাদের বিপ্লব করতে হবে— এরকম ভাবে কয়েকটা কথা ছুঁড়ে দেওয়া নয়। তাদের জীবনের সমস্যার সাথে লিঙ্ক করে সহজ ভাষায় বলতে হবে, যাতে তারা বুঝতে পারে। এটা একটা আর্ট। এটা করতে করতে শিখতে হবে। এটা কেউ কাউকে ক্লাস করে শেখাতে পারবে না। চর্চা করে করে শিখতে হয়। কিন্তু এই কাজটি করতে হবে। এখানে আমাদের ত্রুটি আছে, দুর্বলতা আছে। তাই কমরেডরা বহু মানুষের সংস্পর্শে এলেও তাদের পার্টিজান করে তুলতে পারে না, তারা পার্টির সাথে যুক্ত হয় না, শুধুমাত্র একটা ভাসা ভাসা অ্যাপ্রিসিয়েশন পাওয়া যায়। প্রত্যেক আন্দোলন বা পাবলিক প্রোগ্রামের পর রিভিউ করতে হবে, কী কী ঠিক করেছি, কী কী ভুল করেছি, কী কী শিখেছি, আর কতজনকে ঘনিষ্ঠ করতে পেরেছি, অন্তত সমর্থক করতে পেরেছি।

আর একটা কথা আমি বলব, সমর্থক দরদি যাঁরা, তাঁদেরও দলের সম্পদ হিসাবে গণ্য করতে হবে। নিয়মিত দেখাসাক্ষাৎ করে তাঁদেরও মতামত সাজেশন চাইতে

হবে। আমাদের অনেক কমরেড এক সময়ে ভাল ভূমিকা নিয়েছিল। শারীরিক কারণে হোক, পারিবারিক সমস্যায় ঠিক মতো সংগ্রাম করতে না পারার কারণে হোক বা নেতৃত্বের ভুল ট্যাকলিংয়ে হোক, এখন তারা নিষ্ক্রিয়। তারা যে এক সময়ে দলকে বা ফ্রন্টকে সার্ভিস দিয়েছিল, তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে, তাদের নাম লিস্ট করে যোগাযোগ রাখা, তাদেরও মতামত নেওয়া— এগুলি করতে হবে। মনে রাখবেন, যাঁরা কোনও দিন কিছু সময়ের জন্য হলেও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে এসেছেন, দল বা কোনও ফ্রন্টের সাথে যুক্ত হয়েছেন, যত পুরনো দিনেরই হোক, আর যত দূরেই থাকুক, তাঁদের স্মৃতিতে আজও তার সগর্ব প্রভাব থাকে। এঁরা সংখ্যায় অনেক এবং দলের পক্ষে এক বিশাল সামাজিক শক্তি। আমি আরও বলব, যে কমরেডরা শহিদ হয়েছেন, কারারুদ্ধ হয়েছেন, বেশ কিছু কমরেড বার্ধক্যের কারণে মারা গিয়েছেন, সে সব পরিবারের সাথেও পার্টি কমরেডরা যেন যোগাযোগ রাখে। পার্টি মাস্ট এক্সপ্রেস গ্র্যাটিচিউড টু দেম। তাঁদের দেখানো বা খুশি করার জন্য নয়— আমরা মনে করি, পার্টির শক্তিবৃদ্ধিতে তাঁদের অবদান আছে, পার্টি শ্রদ্ধার সাথে যেন স্বীকার করে। বিরুদ্ধ পক্ষের বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে ফাইট করবেন। তারা যদি অপপ্রচার করে, কুৎসিত মন্তব্য করে, ক্ষিপ্ত হয়ে রুচিবিরুদ্ধ মন্তব্য বা আচরণ করবেন না। সবসময়ই আমাদের রুচি-সংস্কৃতি বজায় রাখতে হবে।

সব শেষে আমার বক্তব্য, বিশ্বের যে পরিস্থিতি দাঁড়াচ্ছে, পুঁজিবাদের যে সঙ্কট— ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠছে এবং আরও জোরালো ভাবে উঠবে— এর থেকে পরিত্রাণ কোথায়? এর থেকে পরিত্রাণ যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা, এটা ভালভাবে বোঝাবার সুযোগ এসেছে। যুক্তি দিয়ে দেখাতে হবে। প্রথমত দেখাতে হবে, সমাজতন্ত্র কী শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছিল, যা দেখে বুর্জোয়া জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা মুগ্ধ হয়েছিলেন, অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। নভেম্বর বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে আমরা কিছু ডকুমেন্ট বের করেছিলাম। সেখান থেকে সংগ্রহ করে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব বিভিন্ন ক্ষেত্রে পয়েন্ট ধরে ধরে দেখাতে হবে। দেখাতে হবে, পুঁজিবাদ অনিবার্যভাবেই ভয়াবহ সঙ্কট সৃষ্টি করবে। একমাত্র সমাজতন্ত্রই সব সঙ্কটের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। লেনিন-স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট ইউনিয়ন এটা ইতিহাসে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছে। আবার সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় কেন ঘটল এবং এই ধরনের বিপর্যয় যে ঘটতে পারে সে ব্যাপারে মার্কস কী বলেছেন, লেনিন কী বলেছেন, স্ট্যালিন কী বলেছেন, মাও সে তুং কী বলেছেন, সর্বোপরি কমরেড শিবদাস ঘোষ কী বলেছেন— সেগুলি তুলে ধরতে হবে। এ সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের আলোচনা এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে ভিত্তি করে আরও যে সব আলোচনা আমরা করেছি, সেগুলো মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। আর একটা হচ্ছে, স্ট্যালিন সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন

নিয়ে যেতে হবে। কমরেড ঘোষ ওয়ার্নিং দিয়ে বলেছিলেন, স্ট্যালিনকে আক্রমণ করা মানেই হল লেনিনবাদকে আক্রমণ করা, মার্কসবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা। এর মানেই হল শোধনবাদ নিয়ে আসা, প্রতিবিপ্লব সংগঠিত করা। ঘটেছেও তাই। বুর্জোয়া এজেন্ট প্রতিবিপ্লবী ক্রুশ্চেভ ও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিরা দুনিয়াতে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে প্রবল কুৎসা রটিয়েছে। স্ট্যালিন যে কত বড় মানুষ ছিলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ তা দেখিয়েছেন 'অন স্টেপস টেকন এগেনস্ট স্ট্যালিন' এই অমূল্য বক্তব্যে। পরবর্তীকালে তাঁর শিক্ষাকে ভিত্তি করে আমরাও কিছু আলোচনা করে দেখিয়েছি। এগুলি ভাল করে কমরেডদের জানতে হবে, বলতে হবে। লক্ষ করুন, বর্তমান সময়ে পুঁজিবাদের এই ভয়াবহ সঙ্কট দেখে মানুষ যাতে আবার মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দিকে, সমাজতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট না হয়, তার জন্য আতঙ্কিত বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা নানা তত্ত্ব খাড়া করছে। বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ ও সংবাদমাধ্যমগুলি মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, মহান স্ট্যালিনের বিরুদ্ধে আবার নানা কুৎসা রটাচ্ছে। এসবগুলির বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। এটা আমাদের আশু কাজ। এর জন্য কমরেডদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব পড়তে হবে, জানতে হবে এবং তার ভিত্তিতে আদর্শগত সংগ্রাম চালাতে হবে। মানবসভ্যতাকে সমাজতন্ত্র কী দিয়েছে, এগুলি দেখাতে হবে। তা সত্ত্বেও প্রশ্ন উঠবে, কী কারণে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটল। দেখাতে হবে, এটা মার্কসবাদের ব্যর্থতা নয়, সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা নয়, ঘটেছে এই এই কারণে। কারণগুলি ভাল করে বুঝে নেবেন। প্রশ্ন উঠলেই চলে আসবে স্ট্যালিন স্বৈরাচারী। সেখানে দেখাতে হবে স্ট্যালিন স্বৈরাচারী ছিলেন না। দেখাতে হবে তিনি কত বড় মানুষ ছিলেন। স্ট্যালিনের চরিত্র কী ছিল, এগুলি এখন কমরেডদের ভালো করে চর্চা করতে হবে। এই সংকটের মধ্যে পড়ে বহু চিন্তাশীল মানুষ পথ খুঁজবে, পরিত্রাণ কোথায় খুঁজবে এবং সেখানে আমাদের উত্তর দিতে হবে। এই স্ট্রাগলের উপরে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

আমি অনেক সময় নিলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম হয়ত বেশি কিছু বলতে পারব না। কিন্তু আলোচনার মধ্যে ঢুকে গিয়ে আমার সময় নিয়ে খেয়াল ছিল না। তবুও বলছি, একটা মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে আছি, বিশ্বের এই পরিস্থিতি, ভারতবর্ষের এই পরিস্থিতি দেখে। এই অবস্থায় আমরা বিপ্লবীরা কিছু করতে পারছি না। ফলে দলের শক্তি বৃদ্ধি অত্যন্ত প্রয়োজন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে যাতে এ দেশে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আরও তীব্র লড়াই করতে পারি এবং তার দ্বারা বিশ্ববিপ্লবকে সাহায্য করতে পারি— এখানকার কমরেডরা, বাইরে যে কমরেডরা আছেন, এই পরিস্থিতিতে আবার নতুন করে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করুন। ২৪ এপ্রিল উদযাপনের তাৎপর্য এখানেই।